ঝড়ের আলো

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এল্

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

ল্য: ১৷০ পাঁচ সিকা

"মানসী প্রেস"

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তোমাকে

উপহার

Presented
To
The Bangiya Sahitya
Parishad.

P. Kleaunde(?)

33. Sitanath(?) Road
Calcutta.

9.8.24

ঝড়ের আলো

—:•:—

বেশ একটুখানি প্রশংসামাখানো দৃষ্টিতে সীতার মুখের পানে চাহিয়া উৎপল কহিল,—এটা কিন্তু আমার কাছে বেশ একটু আশ্চর্য্য ঠেকে। আমাদের সঙ্গে আপনার মতের যখন বিশেষ কোন' পার্থক্যই নেই, তখন কেন যে আপনি ঐ হিন্দুত্বের শুক্‌নো কাঠামোখানা আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌তে এত ব্যস্ত, সেইটেই আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে।

সীতা হাসিল। কিন্তু সে হাসির রেখাটুকু তাহার মুখখানির উপর বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পাইল না। গম্ভীর হইয়া সে হাতের খোলা বইখানার উপর মন নিবিষ্ট করিল, উৎপলের কথার কোন উত্তরই দিল না।

উৎপল কিন্তু কথাটাকে এইখানেই জুড়াইতে দিল না। কহিল,—আচ্ছা, সত্যি, বলুন না, ব্রাহ্ম ধর্ম্মটাকে আপনি কিসে খাটো ক'রে দেখেন?

উৎপলের এই তর্ক করিবার একাগ্র উৎসাহে হাসিয়া ফেলিয়া সীতা কহিল,—কি মুস্কিল! আমি তো মোটেই এটাকে খাটো ক'রে দেখ্‌চি নে!

উৎপল কহিল,—তবে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিতে আপনার আপত্তি কি থাক্‌তে পারে?

সীতা হাসিয়া কহিল,—এ প্রশ্ন কিন্তু একেবারেই খাপছাড়া হ'ল। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে আমি নিশান তুলে দাঁড়াইনি ব'লেই যে আমায় এই ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে হবে, এ রকম যুক্তির আমি ঠিক অর্থ বুঝিনে। সংসারে এমন লোক অনেকে আছেন, যাঁরা তামাক খাওয়াটা দোষের মনে করেন না, অথচ তামাক খান্‌ও না! তাঁ'দের আপনি কি বল্‌বেন?

উৎপল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে কথা আলাদা। কিন্তু, আমি ত' এইটুকুই জানি আর দেখে আসছি, একটা লোক একটা ধর্ম্মকেই বিশ্বাস করে, আর তাই তা'ব করা উচিত।

সীতা বই হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল,—তা হবে। কিন্তু সংসারে এমন লোকও ত' থাক্‌তে পারে, যারা সব ধর্ম্মই মানে, অর্থাৎ কোনো ধর্ম্মই মানে না!—

উৎপল এই শেষের কথাটার ঠিক তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিস্মিতের মত সীতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। ঠিক এমনি মূকভাবে সীতা তাহার বইখানির উপর, এবং উৎপল, সীতার মুখের উপর কতক্ষণ চাহিয়াছিল, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে নাই; হঠাৎ একটি দশ এগারো বছর বয়সের বালিকার আগমনে ঘরের ভিতর একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মেয়েটী একেবারে আসিয়া দুইহাতে সীতার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—আজ আমাদের কেলাসে যে মজা হ'য়েছিল দিদি!

সীতা স্নেহের হাসি হাসিয়া তাহার এই ছাত্রীটির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রত্যহ স্কুল হইতে ফিরিয়া শোভা ঠিক এম্‌নি আদর করিয়া সীতার কাছে একটা-না-একটা মজার কাহিনী বলিতে আসিত। এই সব কাহিনীর ভিতর রহস্যজনক বড় কিছু না থাকিলেও সে সমস্ত ধৈর্য্যের সহিত শুনিতে সীতা ক্লান্তি বোধ করিত না, অল্পদিনের ভিতর এই টুক্‌টুকে ছোট মেয়েটী তাহার এম্‌নিই প্রিয় হইযা উঠিয়াছিল। উৎপল কহিল,—কিরে শোভা, কি মজাটা হ'য়েছে শুনি?

দাদাব এই মধ্যস্থতায় অপ্রতিভ হইয়া গিয়া শোভা কহিল,—আজ কবিতা-বলায় আমি ফাষ্ট হয়েচি; গুরুমা আমায় একখানা ভাল বই দেবেন বলেচেন।

উৎপল হাসিতে লাগিল দেখিযা শোভার আরও লজ্জা করিতে লাগিল। সে ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

উৎপল কহিল,- সত্যি, আপনার এ যে একটা কত বড় গুণ! শোভা আজকাল বাড়ীব সবাইকে ছেড়ে আপনাকেই যেন সব চেয়ে নিজের করে দেখচে। আমি ত' দাদা, আমার কাছে ও একবিন্দু আব্দার করতে সাহস করে না; অথচ এই ক'টা মাসের ভেতর আপনাকে যেন পেয়ে বসেছে!

সীতা হাসিয়া কহিল, তার জন্যে আপনার খুব হিংসে হয় বুঝি? ...এ গুণটুকুও না থাক্‌লে আর পরেব বাড়ী চাকরী চল্‌বে কেন?

—যান্‌, কি যে বলেন! সময়ে সময়ে আপনি কথা কন্‌, যেন আপনি সাধারণ ঝি চাকরেরই সামিল একটা কিছু!

সীতা কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তার নিজের সম্বন্ধে এই কথাটা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আর তাহার ইচ্ছা হইল না, তাই চুপ করিয়া গেল।

উৎপলের পিতা মিঃ গুপ্ত সহরের একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার। আজ প্রায় মাস ছয়েক হইল সীতা এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া উঠিয়াছে। উনিশ কুড়ি বছরের এই নম্র মৃদুভাষিণী মেয়েটীর প্রতি এই পরিবারের সকলেই যেন এই অল্প সময়ের মধ্যে একটু বিশেষ রকম পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল এ সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন, মিসেস্ গুপ্ত। মাসের পর মাস পঞ্চাশটা করিয়া টাকা সীতা যাহাতে কেবল ফাঁকি দিয়া লইতে না পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার একটু বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি প্রায়ই যখন-তখন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শোভাকে কাছে ডাকিয়া তাহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় লইতে বসিতেন। উৎপল কিন্তু মাতার এই সন্দিগ্ধ ব্যবহারকে বড়ই নীচ বলিয়া মনে করিত। সীতার বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষকতার উপর তাহার অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। এমন কি, দুই এক দিন সে মায়ের নিকট সীতার হইয়া গায়ে পড়িয়া ওকালতি পর্য্যন্ত করিয়াছে। এমনও পর্য্যন্ত বলিয়াছে, আমার মনে হয় মা, শোভাকে যথার্থ মানুষ করে তুলতে হ'লে এঁরই হাতে বরাবর ফেলে রাখা উচিত। ইংরিজি লেখাপড়া উনি যতই কম জানুন, মেয়েমানুষের যে যে গুণ থাকা সব চেয়ে প্রশংসার বিষয়, সে সমস্তই শোভা ওঁর কাছে যথার্থ রকম পেতে পারবে।

মা ছেলের কথার কোন উত্তর দিতেন না; বিরক্ত হইলেও তাহা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতেন না।

সেদিন অপরাহ্ণে চায়ের মজলিসটা বেশ একটু সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ গুপ্তের দুইজন বন্ধু টাট্‌কা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহারা আজ এখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মিসেস্ গুপ্ত স্বামীর এই বন্ধু দুটীকে নানা রকম অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিয়া নিজ পুত্রকন্যাদের পরিচয় দিতেছিলেন।

মিঃ সান্যাল একমুখ সিগারের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন,—বাঃ উৎপল তো বেশ কম বয়সেই উন্নতি করেছে দেখ্‌চি! ওর বয়েস কত! কুড়ির বেশী হবে না বোধ হয়? এই বি-এ টা পাশ করলেই ওকে আই-সি-এসের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছ তো হে?

মিঃ গুপ্ত ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—ও বিষয়ে এখনো আমি বিশেষ কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি। ওর যে দিকে tendency—

মিসেস্ গুপ্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমার কিন্তু বরাবরই ঐ ইচ্ছে। তারপর উনি যা বোঝেন—

মিঃ সান্যাল বলিলেন—Rubbish! এর আর বোঝাবুঝি কি?—এমন young age, সিবিলিয়ানির chance টা কেন নষ্ট কর্ব্বে?

সেই সময় ভিতরের দিকের দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া সীতা ও তাহার পশ্চাৎ শোভা প্রবেশ করিল। মিঃ সান্যাল সীতাকে দেখাইয়া মিসেস্ গুপ্তকে বলিলেন, এটি কি আপনার মেয়ে?

মিঃ গুপ্ত হাসিয়া ইহার জবাব দিলেন। কহিলেন,—না, ঠিক মেয়ে নন্। ইনি হচ্ছেন শোভার mistress; শোভা এঁকে দিদি বলে' ডাকে। সে সম্পর্কে আমার মেয়েই বটে!

মিঃ গুপ্তের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু তাঁহার গৃহিণী পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—ইনি এইখানেই থাকেন। বোর্ডিং লজিং ছাড়া ৫০৲ করে' দিতে হয়।

সীতার মুখখানা ক্ষণেকের জন্য লাল হইয়া উঠিল। উৎপল তাহা লক্ষ্য করিল, এবং মায়ের এই পরিচয় দানের অন্তর্নিহিত কণ্টকটুকু বোধ করি সীতার চেয়েও তাহাকেই বেশী করিয়া বিঁধিল। মনে মনে সে উষ্ণ হইয়া বলিতে লাগিল,—কি জঘন্য! এই টাকার কথা তো কেহই জানিতে চাহেন নাই!......সে যেন কতকটা অপরাধীর মত দৃষ্টিতে সীতার পানে চাহিতে গিয়া দেখিল, সীতা ততক্ষণে বেশ সপ্রতিভভাবে মুখ তুলিয়া বসিয়াছে। উৎপল মুহূর্ত্তকাল বিহ্বলের মত সেই মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল; এবং পরে যেন নিজের আচরণে নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মা একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া আছেন।...উৎপল মাথা নীচু করিল।

মিঃ গুপ্ত কহিলেন,—এঁর সব চেয়ে গুণ হচ্ছে, এঁর গান। শোভা এরই ভেতর ভারী সুন্দর গাইতে শিখেচে। শোন' না! শোভা, গাও ত' মা!

লজ্জায় বারেক মাত্র মাথাটী নীচু করিয়া থাকিয়া শোভা ধীরে ধীরে অর্গানের নিকট আসিয়া বসিল। অর্গানের চাবির

উপর তাহার ছোট-ছোট অঙ্গুলি চালনা করিয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া গাহিতে লাগিল,—

আমায় যত ব্যথা তুমি দিয়েছ, সকলি
সহিয়াছি আঁখিজলে।
বজ্র তোমার বুকে পড়ে' প্রভু
পারেনিক' যেতে দলে'।

*　　*　　*　　*

গান যতক্ষণ চলিতেছিল, ততক্ষণ ঘরের ভিতরকার প্রত্যেকেই নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। শুধু সীতা যেন নিতান্ত কুণ্ঠিতার মত মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। গান শেষ করিয়াই শোভা সীতার পানে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, এ গানখানি দিদির নিজের লেখা, নিজের সুর!

তখন একসঙ্গে সকলের দৃষ্টি গিয়া সীতার উপর পড়িল। নীরব উত্তেজনায় তাহার সারা দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। উৎপলের ঠোঁটের আগায় একসঙ্গে যেন হাজার কথা ঠেলাঠেলি করিয়া আসিল; কিন্তু, সে কোন কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে মিঃ গুপ্ত বলিলেন, বাঃ ভারি সুন্দর হয়েছে তো!—কি বল সান্যাল! শুধু সুর বলে' নয়, গানের ভাবটিও হয়েছে ভারী করুণ, ভারী মিঠে!

শোভা ততক্ষণে সীতার কোলের কাছটীতে আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটা যেন গৌরবের হাসি হাসিতেছিল। সীতা কম্পিতহস্তে তাহার মাথার চুলগুলি নাড়িতে-নাড়িতে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—তুমি ভারি দুষ্টু! ও গান কেন গাইলে!

চায়ের সভা ভঙ্গ হইলে উৎপল অবসর খুঁজিয়া একসময় সীতাকে একলা পাইয়া কহিল, বাঃ আপনার লেখবার ক্ষমতাও এমন রয়েছে, তাতো কৈ একদিনও আমায় জানতে দেন্ নি!

কথাটা সে হঠাৎ এমনভাবে কহিল যেন, সীতার এই একটা এতবড় প্রশংসনীয় গুণের কথা জানিবার মত তাহার একটা বিশেষ অধিকার ছিল। সীতা বলিল, না। কাউকেই তো জানাই নি!

উৎপল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল। সীতা কহিল, কবে কোন্‌কালে একখানা গান লিখেছিলুম, তাকেই আপনি এমন প্রশংসা কর্চ্ছেন, যেন—

তার কথাটা শেষ করিতে না দিয়া উৎপল পরম উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়! প্রশংসা করবো না! আমার তো মনে হয়, আমরা—বাঙালীরা প্রকৃত গুণের আদর করতে জানিনে বলেই সব দিক দিয়ে এম্‌নি করে' নেমে যাচ্চি। আপনার ঐ গান, সত্যি বল্‌চি, ও লেখা যে হাত থেকে বেরুতে পারে, তাঁর কাছে আমরা যে অনেক বেশী আশা করি! শুধু ঐ একখানা গান লিখেই থেমে গেলে—

সীতা হাসিয়া কহিল,—থামুন, করেন কি! আপনার মত

এই রকম দু'চারজন সমালোচক বাংলা সাহিত্যের আসরে জেঁকে বসলে তো দেখছি, নিত্যি নতুন-নতুন বঙ্কিমবাবু আর রবিবাবু গড়ে' তুলবেন।

বাধা পাইয়া উৎপল তাহার বক্তৃতাটি আর ভাল গুছাইয়া বলিতে পারিল না। সীতা শোভাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল'

---

(২)

ত্রিতলের ছাদের উপর সীতা একা দাঁড়াইয়া কি একটা বোনার কাজ শেষ করিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতে সে হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া একটি কোণে আলিসার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত কলিকাতা সহরটা সেখান হইতে এক বিরাট চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বদিকে অসংখ্য কলকারখানা হইতে অবিরাম ধূম উদ্গীর্ণ হইয়া সন্ধ্যার পাংশু আকাশখানাকে আরো মসীময় করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকের বিশাল সৌধশ্রেণী যেন সাগরের তরঙ্গমালার মত পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টা করিতেছে। সীতা একান্ত স্তব্ধভাবে এই দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে যেন তাহারই বিশালতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। এমন সময়ে পিছনে পায়ের শব্দে সে ফিরিয়া দেখিল— উৎপল।

উৎপল হাসিয়া কহিল,- আচ্ছা বলুন্ তো, চুরি করে' তার অপরাধ স্বীকার কর্লে কি হয়?

সীতা এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিল না। কহিল,—কি জানি! খুব সম্ভব শাস্তিই হয়!

উৎপল হাসিতে-হাসিতেই কহিল, নাঃ, আপনি দেখ্‌চি

বড় কড়া হাকিম! কিন্তু শাস্তিই দিন্ আর যা'ই করুন, আমি আজ আপনার এক অমূল্য সম্পদ্ চুরি করেচি।

সীতা বিস্মিত হইল। কহিল, আমার?

উৎপল বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি মনে করেছিলেন, ফাঁকি দিয়েই পার পেয়ে যাবেন! কিন্তু আমি ধরে' ফেলেচি। বঙ্গসাহিত্যের একটা রত্ন আমি উদ্ধার করিচি বলে' আমার নিজের গৌরব হচ্ছে!

সীতার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। অতিমাত্র বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—সেকি! আমার একখানা খাতা—

উৎপল কহিল, হ্যাঁ। আগেই তো বলিচি, আমি অপরাধ কবুল কর্চ্ছি। তাতে আপনার যা অভিরুচি—!

উৎপলের এ রহস্য সীতার ভাল লাগিল না। সে বিরক্তির সহিত কহিল,—এ কিন্তু অন্যায়! উৎপল দমিবার ছেলে নয়। সে তথাপি হাসিয়া কহিল,—তাতো বটেই। চুরি কি আর কখনো ন্যায়সঙ্গত হয়?

সীতা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পরে কহিল,—কোথায় রেখেছেন সে খাতা? উৎপল কহিল,—সে ভয় কর্ব্বেন না যে আমি সেটা নষ্ট কর্ব্ব! তার এক একটি কবিতা আমার কাছে এক-একটি রত্ন!

সীতা কহিল,—কিন্তু সে সব আপনি কেন দেখ্‌তে গেলেন? ও সব ছাই ভস্ম আমার কখনো কাউকে দেখাবার ইচ্ছা ছিল না! আপনি ভারি অন্যায় কর্লেন!

তাহার রুদ্ধ গাঢ় কণ্ঠস্বরে উৎপলের মুখে এবার আর কথা সরিল না। সে একান্ত নীরবে সেই মূর্ত্তিখানির পানে তাকাইয়া রহিল। পরে ধীরে-ধীরে করুণ স্বরে কহিল,—আমার ওপর রাগ কর্লেন?

সীতা হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—না, রাগ কেন কর্ব্ব? আপনার অন্যায় যে খুব গুরুতর, তাও কিছু নয়, কিন্তু—

উৎপলের মন পুনরায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একান্ত উৎসাহের সহিত সে কহিল—তা আমি জানি। যা'ই কিছু আমি করি, আমার ওপর যে তুমি কখনো সত্যিকার রাগটুকু কর্ত্তে পার্ব্বে না, সে বিশ্বাস আমার যথেষ্ট আছে।

এই আকস্মিক 'তুমি' সম্বোধনে সীতা একবার চকিতার মত উৎপলের মুখের পানে চোখ তুলিল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছিল; তাহারই ক্ষীণ রশ্মিতে মণ্ডিত সীতার সেই মুখখানির পানে উৎপল যেন আর চোখোচোখি চাহিতে পারিল না। অপরাধীর মত সে মাথাটি নীচু করিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের তপ্ত রক্তের ভিতর দিয়া যেন একটা ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট পুলকপ্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছিল। যখন আবার সে মুখ তুলিল, তখন দেখিল, ছাদের উপর সে একা; সীতা নিঃশব্দে কখন নীচে নামিয়া গেছে।

কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা লইয়া সীতা বরাবর নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। টেবিলের সাম্‌নে চেয়ারের উপর সে অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে টেবিলের উপরকার একখানা বই তুলিতেই তাহার ভিতর হইতে একখানা

চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। উপরে তাহারই নাম লেখা। অন্যমনস্কে সে চিঠি খানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম দুই এক ছত্র পড়িয়াই সে তাড়াতাড়ি নীচের নামটা পড়িল, মিসেস্ গুপ্ত। তখন সে এক নিশ্বাসে চিঠি খানা পড়িতে গেল ; কিন্তু পারিল না। মাঝের কথাগুলা যেন আগুনের মত তেজে তাহার চোখদুইটা অন্ধ করিয়া দিবার যোগাড় করিল। অনেক কষ্টে সে পাঠ শেষ করিল। তাহাতে লেখা ছিল,—

'মা সীতা! তোমাকে আমরা আমাদের পেটের মেয়ের চেয়ে কোন অংশে খাটো করে দেখিনি। কিন্তু, একটা কথা না বলে আর থাক্‌তে পাচ্ছিনি। দেখ বাছা, উৎপল ছেলেমানুষ, তোমারই চেয়ে বড় জোর বছর খানেকের বড় হবে!...তা, আজকালকার নব্যসমাজে মেয়েপুরুষের মধ্যে স্বাধীনতা যতই চলিত হোক্, বা হবার প্রস্তাব হোক্, তার ফল যেটা চিরকাল হ'য়ে আস্‌ছে তা হবেই! উৎপল এখন এই সবে বি-এ পড়্‌ছে, পাশ কর্লে ও বিলেতে গিয়ে সিবিলিয়ানী পড়বে। এখন তো আর ওর বাজে ছাইভস্ম গল্পগুজব নিয়ে সময় কাটাবার দিন নয়! ও-ই না হয় ছেলেমানুষ, তুমি তো এটা বোঝ! তুমি আমাদের এখন একজন আপনাদেরই মধ্যে ; আমরা আশা করি, সব দিক্ দিয়েই যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাই তুমি কর্ব্বে। উৎপল সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে এমনতর শত্রুতা কর্লে চল্‌বে না তো মা!'

এই অদ্ভুত চিঠিখানা সীতা দুই তিনবার আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিল। যে কুৎসিৎ অভিযোগটুকু মিসেস্ গুপ্ত সীতার বিরুদ্ধে

করিতে চাহিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত যে এই চিঠি খানার ভিতর কত সুস্পষ্ট, এবং কৃত্রিম স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়াও যে তাহা কত নগ্নভাবে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা সীতা তাহার প্রাণমন দিয়া উপলব্ধি করিল। তাহার সমস্ত হৃদয়খানার উপর যেন কে অকস্মাৎ কাঁটার প্রহার করিয়া করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। এ নিদারুণ আঘাত সীতার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। সে একান্ত অবসন্নভাবে তক্তপোষের উপর বিছানায় এলাইয়া পড়িল।

পড়িয়া পড়িয়া সে অনেক কথা ভাবিল। সব চেয়ে বেশী করিয়া ভাবিল, ঐ উৎপলের কথা। সত্য বটে, এই একান্ত অপরিচিতের সংসারে আসিয়া সে যেমন স্নেহের পুতুলটির মত শোভাকে পাইয়াছিল, তেমনি উৎপলের ভিতরও কথা কহিবার—আলাপ করিবার একটি বন্ধুকে পাইয়াছিল। কিন্তু, ঐখানেই কি তাহার পরিসমাপ্তি ছিল না? তাহার সমস্ত কথা, আচরণ কি ঐখানেই সে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই?···সীতা তন্ন তন্ন করিয়া এখানকার এই ছয় মাসের সমস্ত ইতিহাসটা ওলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু কোনদিন, কোথাও সে নিজের এই ঘৃণিত দুর্ব্বলতার লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। তবে এ মিথ্যা অভিযোগ কেন? উৎপলকে সে নিজের ফাঁদে জড়াইয়া তাহার পিতামাতার সহিত শত্রুতা করিতেছে?···বিদ্রোহীর মত তাহার মন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কখখনো না! শত্রুতা করিতে সে এখানে আসে নাই। এই দীর্ঘ জীবনের ভিতর শত্রুতা সে কাহারো সহিত করে নাই, বরং

এই সংসারেরই নিকট হইতে কত ঘোরতর শত্রুতা সে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া উঠিয়াছে !.........

টপ্ টপ্ করিয়া সীতার চোখের জল তাহার বুকের উপর ঝরিয়া পড়িল। তথাপি কি যেন একটা গর্ব্বের আস্ফালনে সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। সঘন নিশ্বাসে তাহার উন্নত বক্ষ দ্রুত উঠিতে পড়িতে লাগিল।

দিদি !

চকিতার মত সীতা চাহিয়া দেখিল, শোভা কখন্ তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে কি করিবে বা বলিবে হঠাৎ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। শোভা তাহার দুখানি কোমল বাহু দিয়া একেবারে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিল। সীতা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই শোভা বলিয়া উঠিল,—ওমা, তোমার বুক যে ভিজে গেছে দিদি ! কিসে ভিজল ?

সীতা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, কি জানি। কৈ, তুমি গান শিখ্‌বে না ?

শোভা কহিল, বা-রে ! একলা আমি এতক্ষণ বসে' থেকে তবে ত' তোমার কাছে এলুম !

সীতা হঠাৎ গভীর লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শোভার মাথায়-বাঁধা ফিতাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে মাণিক, কিছু মনে ক'রো না !

—য্যাঃ, মনে আবার কি কর্ব্বো ! কী যে বল তুমি ! আমি

আজ গাইবও না। তুমি আমায় একটি গল্প বল। বলিতে বলিতে শোভা একেবারে সীতার কোলের উপর মাথাটী রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

---

(৩)

পরের দিন সকালে উৎপলের সহিত সীতার যখন সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন সীতা ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অতিক্রম করিয়া গেল। উৎপল ঠোঁটের আগায় কি একটা কথা লইয়া তাহা প্রকাশ করিবার অবকাশটি পর্য্যন্ত পাইল না। মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তম্ভিতভাবে একটা স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত স্থানে সে যেন একটা রীতিমত ঘা খাইল। তাহার পর হইতে সে যতবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া সীতার কাছে-কাছে আসিয়া পূর্ব্বদিনের মত একটা-না-একটা কিছু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই যেন সীতা নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে তাহাকে দুই হাত দিয়া বহুদূরে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। উৎপলের পক্ষে যেন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। একবার সে খুব খানিকটা রাগ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। মনে-মনে বলিল, —বেশ ত, সেও আর তাহার সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহিবে না!—এই যে সংসারে কত সহস্র লোক রহিয়াছে যাহারা সীতার ছায়াটী পর্য্যন্ত দেখে নাই,—তাহাদেরও তো দিন কাটিতেছে, এবং বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটিতেছে! এই একটা নগণ্যা নারীর সহিত পরিচয়, তাহার সহিত আলাপ করাটাই তো আর মানব-জীবনের সার্থকতা নয়? তবে সাধিয়া সে কেন অপমান সহ্য

করিবে ?······একটা যেন আত্মজয়ের গর্ব্ব লইয়া উৎপল তাহার পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি খুলিয়া বসিয়া তাহাদের ভিতর নিজেকে একেবারে মগ্ন করিয়া ফেলিতে চাহিত ; কিন্তু সে অসম্ভব ! যে অঙ্ক সে চোখ বুজিয়াও নির্ভুল করিয়া কষিয়া যাইতে পারিত, তাহাকেই এখন অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়াও সে যেন কোন মতেই আয়ত্ত করিতে পারে না। শেক্স্পীয়রের যে সব নাটক সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার পড়িয়া ফেলিয়াছে, তাহারই ভিতরকার এক একটা চরিত্রের পরিচয় সে যেন এখন শত চেষ্টাতেও মনে করিয়া রাখিতে পারে না। বিরক্ত হইয়া উৎপল বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে,—কিন্তু তাহার ভিতরেও যেন একটা উন্মত্ত একাগ্রতা তাহাকে অতি শীঘ্রই ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়া পুনরায় বাড়ীর দিকে ফিরাইয়া আনে।

এম্‌নি একদিন—দুইদিন করিয়া প্রায় তিনটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সীতার ব্যবহারের একবিন্দু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। নিয়তির মত অন্ধ নিষ্ঠুরতা লইয়া সে তার নিজের কাজগুলি ঘড়ির কাঁটার মত করিয়া গিয়া বাকী সময়টুকু নিজের ঘরে একা অথবা শোভাকে লইয়া কাটাইয়া দেয়। তাহার এই কঠোরতার বর্ম্মে লাগিয়া উৎপলের কাতর প্রাণের সমস্ত নীরব আবেদন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; সেদিকে একবার ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর-টুকু পর্য্যন্ত তাহার হইয়া উঠে নাই।

সেদিন সীতা কি-একটা প্রয়োজনে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে উৎপল টেবিলের উপর কি-একখানা খাতা অথবা বই লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছে। উৎপলও মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার সুন্দর শুভ্র মুখখানি হঠাৎ যেন আরক্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথাটা নীচু করিয়া কহিল,—এ মাসের 'পূর্ণিমা'তে আপনার একটা কবিতা বেরিয়েচে, দেখবেন।—বলিয়া যেন সীতার কাছে নিজের দর বাড়াইবার জন্যই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু, এ সকল ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল। সীতাকে চোখের আড়াল করিয়াই নিজের মূর্খতার জন্য উৎপল নিজেকে অভিশম্পাত করিতে লাগিল।

সীতা প্রথমটা যেন উৎপলের কথার অর্থটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তেম্‌নি অবস্থাতেই সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সত্যই তাহার টেবিলের উপর একখানা সদ্যঃ প্রকাশিত মাসিক পত্র। সে তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া একটা সন্দেহ-মিশ্রিত অননুভূত হর্ষের আবেগে বইখানার পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিল। একস্থানে আসিয়া তাহার দৃষ্টি সংযত হইল। একখানি পৃষ্ঠার প্রারম্ভে বড়-বড় হরফে লেখা আছে,—"পরিত্যক্তা"; এবং তাহারই নীচে লেখা—শ্রীসীতা দেবী। সীতার মাথার ভিতর এই অক্ষরগুলা যেন একটা অশ্রান্ত পুলক-সঙ্গীতের তালে-তালে নৃত্য করিতে লাগিল। কোন রকমে নিজেকে সংযত করিয়া সে সমস্ত কবিতাটা পড়িয়া ফেলিল। কত কর্ম্মহীন অলস মুহূর্ত্তে সে এই কবিতা বার-বার করিয়া পাঠ করিয়াছে, একই অর্থকে

সে কত দিক দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের মনোরঞ্জন করিয়াছে ; তথাপি সেই একই কবিতাটা পাঠ করিতে আজ কতই না নূতনত্ব সে অনুভব করিল! সীতার সমস্ত প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। গত কয়দিনের সঞ্চিত সমস্ত বিষাদের বোঝা যেন তাহারই উদ্দাম প্রবাহে শরতের মেঘের মত কোথায় উড়িয়া গেল।

কবিতার পাতাটায় একটা আঙ্গুল রাখিয়া সীতা বইখানার মলাটটা দেখিতে লাগিল। মাঝখানে একটা রঙ্গীন ছবি,—পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পল্লীর শান্ত সৌন্দর্য্য ; সেই ছবিরই এক কোণে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে নাম লেখা, 'পূর্ণিমা'! এ মাসিক পত্রিকা সীতা পূর্ব্বে আর কখনো দেখে নাই ত! ছবির নীচে তাকাইতেই দেখিল, তাহার সন্দেহ সত্য। এ একখানি সম্পূর্ণ নূতন কাগজ ; সবে এই দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইয়াছে। কিন্তু নূতন হইলেও বইখানিকে সাধারণের নয়নরঞ্জন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্টই চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হইল। সীতা সম্পাদকের নাম খুঁজিল। দেখিল, একেবারে নীচে লেখা ; সম্পাদক,—শ্রীনিশানাথ চৌধুরী, এম্, এ।

মুহূর্ত্তমধ্যে যেন কি একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সংঘাতে সীতার কমনীয় শরীরখানি যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিল। তাহার দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল ; দুই শুভ্র দন্তপাঁতি এক সঙ্গে সংবদ্ধ হইয়া অধরের ফাঁকে দেখা যাইতে লাগিল। মুখের ভাবখানা তার পাংশু এবং বিকৃত হইল বটে, কিন্তু, তাহার ভিতর কেমন যেন একটা তীব্রতা সুস্পষ্ট হইয়া

উঠিল। নির্নিমেষ নয়নে সীতা সেই নামটার উপর তাকাইয়া রহিল।···অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে-ধীরে যখন বইখানা নামাইয়া রাখিল, তখন একটা আকস্মিক গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন তাহার সারা বুকখানা শূন্য করিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দুই হাত দিয়া সীতা নিজের অজ্ঞাতেই তাহার বুকখানা চাপিয়া বসিয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল সে ঠিক একই ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিল, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না;—দেহের একটা অঙ্গও বুঝি তাহার সঞ্চালিত হইল না; শুধু মরণেরই মত করাল কি-এক মন্ত্রজালে সে সমাহিত হইয়া বসিয়া রহিল।

* * * *

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহ-সংলগ্ন বাগান হইতে একটা সুপারিগাছ মাথা হেলাইয়া ঠিক সীতার ঘরের একটা জানালা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অন্ধকারে তাহার পাতাগুলি সর্ সর্ শব্দ করিতেছিল। সেই শব্দতেই সীতা হঠাৎ ভয়ে চকিত হইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পরক্ষণেই সে ক্ষিপ্রহস্তে বিজলী-বাতির বোতাম টিপিয়া দিল। ······কিন্তু কিছুতেই যেন সীতা আজ নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছিল না। তাহার জীবনের উপর দিয়া কি যেন একটা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহা সে বিন্দুমাত্র আশা করে নাই; তাহার এই নগণ্য জীবনের সুখদুঃখ লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ কি-যেন একটা সে পাইয়াছে, যাহাকে অমৃত বলিয়া সাদরে

গ্রহণ করা ত' একেবারেই অসম্ভব, আবার গরল জানিয়াও হেলায় দূরে ফেলিয়া দিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই! ধ্বংস যেমন বিরাট আকর্ষণে পতঙ্গকে আগুনের উপর টানিয়া লইয়া যায়, ঠিক তেমনিই যেন কে আজ অলক্ষ্যে বসিয়া সীতাকে একটা চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝে টানিয়া নিক্ষেপ করিতে চাহিল। তাহারই সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে সীতার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। শেষে সে রণে ভঙ্গ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উত্তপ্ত চোখে-কাণে ভাল করিয়া ঠাণ্ডা জল লাগাইয়া সে একেবারে শোভার পাঠ-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে শোভা ছিল না; একপাশে একখানা চেয়ারে উৎপল চুপটী করিয়া বসিয়াছিল। সে সীতাকে হঠাৎ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া একটু ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিল,—বসুন; আপনার কবিতাটি ভারী সুন্দর হয়েচে। নিশানাথবাবু বলেচেন, তিনি সব কবিতাগুলিই একে একে তাঁর কাগজে প্রকাশ করবেন। সীতা ইহার উত্তরে কি একটা বলিল, বুঝা গেল না। এবং উৎপল আর একটা প্রশংসার কথা ভাল করিয়া মক্স করিতে-করিতেই সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল, প্রায় তেম্‌নি দ্রুতই সেখান হইতে প্রস্থান করিল। উৎপল অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুকে যেন কে একখানা ছুরি আমূল বসাইয়া দিল। মিনিট পনের পরে যখন সীতা পুনরায় ঘরে ঢুকিল, তখন শোভাকেও তাহার সহিত আসিতে দেখিয়া উৎপল মাথাটী নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

• •

কিন্তু, উৎপলের নিকট সীতার এই হৃদয়-হীন ব্যবহার আজ একেবারেই অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হইল। সে ত' সীতার জন্য কত করিতেছে; এই যে সে নিজে উদ্যোগী হইয়া নিশানাথ বাবুকে ধরিয়া তাহার কবিতাগুলি ছাপিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল, তাহারও জন্য কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা নাই! হা রে জগৎ! দুঃখে ক্ষোভে সত্য সত্যই উৎপলের চোখে জল আসিয়া পড়িল।···সত্যই সে সীতাকে ভালবাসিয়াছে! তাহাতে দোষই বা কোথায়, আর লজ্জা করিবারই বা কি আছে! প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ, মর্ত্ত্যের মানুষকে স্বর্গের পরিচয় দিবার জন্যই তো ইহার সৃষ্টি! এমনি করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া উৎপল নিজের মনে প্রেমের গুণকীর্ত্তন সুরু করিল। এত দিন সে যে ভাবটাকে অনেক চেষ্টা করিয়া নিজের অন্তরের কাছেও গোপন রাখিবার প্রয়াস করিতেছিল, আজ এই মৌন সন্ধ্যায় নিভৃত ঘরে বসিয়া সে তাহার সমস্ত গোপন কথা যেন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।...সমস্ত জগৎকে সে শুনাইয়া দিবে, ঐ সীতাকে সে ভালবাসে! দেখিতে সে একটু কালো বটে, কিন্তু এখানে তো সে তাহার রূপের বিচার করে নাই, করিবেও না; শুধু এইটুকু সে জানে, সীতাকে পাইলে সে জগৎ ভুলিয়া—আপনা ভুলিয়া তাহার কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে;—এ নশ্বর জীবন সার্থক করিবে!

এমনি করিয়া নবীন যৌবনের কল্পনার উদ্দাম গতি উৎপলকে বহু —বহু দূরে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সেদিন রাত্রে কিছুই সে আহার

করিতে পারিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে তার এই দুর্দ্দমনীয় ভাবুকতার খেয়ালে নিজেকে নিরাশ্রয় ভাবে ছাড়িয়া দিয়া তাহারই আবেশে বিভো'র হইয়া রহিল। সীতাকে সে বিবাহ করিবে। কেন করিবে না? তাহাদের মিলনের বিঘ্ন কি হইতে পারে? সীতা রাজী হইবে না? কেন, সে কিসে তাহার অযোগ্য? সে ত তাহাকে ভালবাসে! কবিরাই বলিয়া গিয়াছেন, ভালবাসা থাকিলে অপর সকল অভাবই পূর্ণ হইয়া যায়!

এমনি করিয়া নানা রকম সম্ভব অসম্ভব প্রশ্নোত্তরের মাঝে নিজের মস্তিষ্ক নিষ্পেষিত করিয়া শেষ রাত্রে কেমন একটা স্বচ্ছন্দ আলস্যে সে নিদ্রার কোলে ঢুলিয়া পড়িল।

(৪)

রবিবারের অপরাহ্ন। আজ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনার একটু বিশেষ রকম আয়োজন ছিল। বেলা চারিটার পর মিঃ গুপ্ত স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখনো আচার্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হন নাই। দুই তিনটী মহিলা সেতার ও এস্‌রাজ লইয়া তাহার সুর-সংশোধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। উৎপল একান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল।

মহিলাগণ একখানি উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পর আচার্য্য উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উৎপল খানিকক্ষণ বিধিমত চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমে যেন কেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কোন রকমে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া সে আচার্য্যের আসন গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় বসিয়া রহিল। কিন্তু, আচার্য্য যেমন তাঁহার প্রথম উক্তি শেষ করিলেন এবং ওদিকে হারমোনিয়মে সঙ্গীতের সুর উঠিল, ঠিক সেই সুযোগে উৎপল চুপি-চুপি উঠিয়া দাঁড়াইল। কাহারো পানে ফিরিয়া না তাকাইয়াই সে একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। খানিকটা পথ হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া আসিতেই হঠাৎ একটী যুবকের সহিত প্রায় ধাক্কা খাইয়া দুই জনেই থামিয়া পড়িল। যুবকটী উৎপলের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—

কিহে, ব্যাপার কি বল ত ?—তোমার যে আর দেখাটি পাবার যো নেই ! আমি তো তোমার ঠিকানা জানি নে, তাই কতদিন খোঁজ করে'ও তোমায় ধরতে পারিনি !

উৎপল তাহার স্প্রীংয়ের চশমার ফাঁকে বঙ্কিমদৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিয়া কহিল, - আমার খোঁজ করছিলে ! কেন বল দেখি ! হঠাৎ এ দয়ার তাৎপর্য্য কি ?

যুবকের মুখখানি যেন মুহূর্ত্তে একটু উজ্জ্বল এবং আরক্ত হইয়া উঠিল। পকেট হইতে সে একখানি গোলাপী লেফাফা বাহির করিয়া উৎপলের হাতে দিয়া কহিল,—পড়লেই বুঝতে পার্ব্বে।

উৎপল দেখিল, লেফাফার এক কোণে সোণার জলে লেখা—'শুভ বিবাহ'। ভিতরে একখানি সৌখীন গোলাপী কার্ড—তাহাতে লেখা আছে,—"ভাই, আস্‌চে শুক্রবার মধুনিশায় আমার নবজীবনের উদ্বোধন। জীবনরাণীকে অভ্যর্থনা কর্ব্বার এই শুভ ক্ষণে তুমি না এলে সেটা বড়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই এই আমন্ত্রণ। রবিবার সন্ধ্যায় অধীনের গৃহে প্রীতিভোজন।

ইতি—তোমাদের অমল।"

উৎপল খানিকক্ষণ ভাল করিয়া কার্ডখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ ব্রেভো ! Happiest news in the world ! কি বল ?

আরো দুই চারিটা কথার পর বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলে উৎপল একখানা ট্রামে উঠিয়া ধর্ম্মতলার দিকে চলিল। তথায় একটি

কোণে বসিয়া পুনরায় অমলের বিবাহের সেই কার্ডখানি খুলিয়া তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, আহা, অমলের হৃদয় আজ কত সুখী, কত পূর্ণ! তাহার মুখের সেই লজ্জামাখা হাসিটুকুতেই সুস্পষ্ট বোঝা গেল, এ বিবাহে সে কত সুখী! মেয়েটীকে নিশ্চয়ই সে নিজের মনের মতনটী দেখিয়া বিবাহ করিতেছে! কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে বেশ হইত! মেয়েটি কি করে, দেখিতে কেমন, তাহার সহিত কত দিনের পরিচয়! নিশ্চয় অমল তাহাকে খুব ভাল বাসিয়াছে, নহিলে, যাহার সহিত প্রাণের পরিচয় হইল না, সে কখনও কি জীবনরাণী হইতে পারে? এমনি নানা বিতর্ক করিয়া সে কার্ডখানা পকেটে পুরিয়া নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া গেল। এমন দিন তাহারও জীবনে একটা আসিবে। সে কি সুখের দিন, কি মহিমায় মণ্ডিত!—কিন্তু, সীতাকে ছাড়া উৎপল আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। সে প্রতিজ্ঞা তো নিজের কাছে একাধিকবার করিয়া ফেলিয়াছে! সীতা প্রত্যাখ্যান করিলে সে বিবাহই করিবে না। ইতালির বিখ্যাত প্রেমিক কবি দান্তের মত প্রিয়ার চিন্তাটাকে হৃদয়ের কাছে অমর করিয়া রাখিবে! কিন্তু, দান্তের উপরও উৎপল বেশ খুসী হইতে পারিল না। বিয়েট্রিসকে ভালবাসা সত্ত্বেও তিনি অপর নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; উৎপল হইলে সে এই দুর্ব্বলতাটুকু প্রকাশ করিত না।

সমস্ত বাড়ীর ভিতর সীতা একা। আজ আর তাহার বাড়ীর

বাহিরে যাইবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। তাই তাহার নির্জ্জন ঘরখানিতে বসিয়া ছোট হারমোনিয়মটী কোলে তুলিয়া আপনার মনে গান গাহিতেছিল—

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙ্গীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥..."

নিজেকে মগ্ন করিয়া দিয়াই সীতা গান গাহিতেছিল; যখন তাহা শেষ হইল, তখন হঠাৎ তাহার বামদিকের দরজার পাশ হইতে কে বলিয়া উঠিল, বা, কি সুন্দর!

সীতা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, উৎপল। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। উৎপল কহিল, সত্যি বলচি, তোমার এ গান স্বর্গের জিনিষ।

সীতা মুখ ফিরাইয়া হারমোনিয়ম বন্ধ করিয়া কহিল—আপনি না সমাজে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ফিরে এসেছি। ও সব উপাসনার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম আমরা এখন কিছু বুঝি না; আর বোঝবার বয়সও এ নয়!

এ কথায় সীতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসিল। কহিল, তাহলে যাতে কেবল প্রবীণ প্রবীণা ছাড়া এ উপাসনা থেকে অপর সকলকে নির্ব্বাসিত করা হয়, তার ব্যবস্থা আপনারা করে নিলেই ত পারেন!

উৎপল হাসিয়া একখানা চেয়ার লইয়া বসিয়া পড়িল। সীতার কথার কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল—তবু ভাল, আজ

তোমার মুখে একটা কথা শোনা গেল! এমন নির্জ্জনে না দেখা করলে কি—কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। সীতার মুখখানা হঠাৎ বড় বেশী রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উৎপলের এ অসংলগ্ন কথার অর্থই বা কি, উদ্দেশ্যই বা কি? সে তাড়াতাড়ি তাহার কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতে গিয়া কহিল—কখ্খনো না। ওটা আপনার ভুল। আমি এখানে আপনাদের বাড়ীতে যতই হোক চাকরী করতে এসেচি। আপনার সঙ্গে আমার বেশী কথার অবসর কি করে হয়ে উঠবে?

উৎপল গম্ভীরভাবে কহিল—আমি সে কথা মানি না। সীতা কহিল,—সে আপনার খুসী। এখন ও সব বাজে কথা যাক্। আমায় এখুনি একটু বেরুতে হবে। আপনি কি—

উৎপল খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে সীতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে করুণ দৃষ্টির সামনে সীতাকে বাধ্য হইয়া মাথা হেঁট করিতে হইল। উৎপল গাঢ়স্বরে কহিল,—সীতা!

উৎপলের মুখে এমন অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সীতা স্তব্ধ হইয়া ঠিক তেমনি নতমুখে বসিয়া রহিল। উৎপল কহিল—সীতা! কেন তুমি আমায় এমনি করে দিনরাত্রি এড়াতে চাইছ, তা এক ঈশ্বর জানেন। তোমায় কোথায় বেরুতে হবে তা আমি জানি না; কিন্তু আমি যে এখন এইখানে থাকতে চাই! এইখানে—তোমার কাছেই আজ আমার প্রয়োজন!

সীতার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া উঠিতেছিল। উৎপল হঠাৎ আবেগভরে কহিল—শোন, আমি আজ তোমায় কোন কথা

লুকোব না।······তুমি এ কথা জানো আর নাই জানো, আমি তোমায় ভালবাসি। সে ভালবাসার চরম পারণতি কি, তাও আমি এই ক'দিনে ভেবে রেখেচি। · আমি তোমায় বিবাহ করতে চাই। হ্যা, বিবাহ কর্ব্ব। তুমি তুমি—আর তুমি তখন আমাদের পর বলতে পারবে না ; তুমিই হবে সব চেয়ে আপনার !

এই কথাকয়টা বলিতেই উৎপল যেন হাঁফাইয়া উঠিল। সীতা কিন্তু কোন উত্তর দিল না, বা মাথাও তুলিল না। উৎপল পুনরায় কহিল—আমি কি প্রতিজ্ঞা করেছি জানো ?—আমি - আমি—

সীতা হঠাৎ তীব্রভাবে বাধা দিয়া কহিল, চুপ কর।

উৎপল যেন একটু থতমত খাইয়া কহিল—কিন্তু সীতা, আমি আজ তোমার সামনে শপথ করে বলচি —

সীতা বলিয়া উঠিল—থাক্, আবার কেন ? তোমার শপথ তোমার কাছেই থাক্। কেন না, শপথ যাই হোক্, সে শপথ রক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই।

নেই ?

না।

উৎপল কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল—কেন ?

সীতা যেন কেমন এক রকমের হাসি হাসিয়া কহিল—কি মুস্কিল ? এর আবার 'কেন' আছে নাকি ? এইটুকুই কি যথেষ্ট নয় যে আমার সম্মতি নেই ?

উৎপল তাহার বুকের উপর বাহু দুখানি বদ্ধ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উপর দিকে মুখ করিয়া কহিল—যথেষ্ট কেন হবে

না? তবে এইটুকু আমার জানতে ইচ্ছা ছিল, আমি কিসে তোমার অযোগ্য! বলিতে বলিতে তাহার চোখ যেন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

সীতা কি বলিতে মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু নীরবেই মাথা হেঁট করিল; কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ এমনি দুজনেই নীরব থাকার পর সীতা মুখ তুলিল। কথা কহিবার পূর্ব্বে তাহার মুখখানা যেন কি একটা নবভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া উঠিল - তবে শোন, সব চেয়ে মারাত্মক বাধা এই হচ্ছে যে, - তুমি যাকে বিবাহ করতে চাও, সে বিবাহিতা এবং তার স্বামীও এখনো বেঁচে।.......

উৎপলের মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল। সে বিস্ময়ে হাঁ করিয়া সীতার সেই স্থির পাংশু নিশ্চল মূর্ত্তিখানার পানে তাকাইয়া রহিল।

ঠিক সেই সময় নীচের তলায় একসঙ্গে একাধিক লোকের পদশব্দ শোনা গেল। উৎপল বুঝিল, বাড়ীর অপর সকলে সমাজ হইতে ফিরিয়াছে। সে যে উপাসনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, এতক্ষণে এই একটা কথাই যেন হঠাৎ সব চেয়ে বড় হইয়া তাহার অন্তরে দেখা দিল। অধিকন্তু, সেখান হইতে ফিরিয়া সে যে এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় সীতার ঘরে বসিয়া আছে, এ কথাটা যে কত লজ্জাজনক, তাহা যেন হঠাৎ তাহার চোখে নগ্নভাবে ফুটিয়া উঠিল। তাহার জননীর গলা শুনিয়া বুঝিল, তিনি সিঁড়িতে উঠিতেছেন। যদি তিনি এই দিক দিয়া যাইতে

যাইতে তাহাকে এই ঘরে দেখিতে পান! অথচ, এখন ঘর হইতে বাহির হইতে গেলেও তাঁহার নজরে পড়িতে হয়!…উৎপল আর কিছু না ভাবিয়া পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

এই ব্যাপারটুকু ঘটিতে বোধ করি এক মিনিটেরও কম সময় লাগিয়াছিল। সীতা এতক্ষণ ঠিক তেমনিভাবে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। দরজা বন্ধ করিতেই সে সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—ও কি!—

উৎপল একান্ত করুণ চাপা গলায় বলিল—একটু দাঁড়াও। মা ওপরে চলে গেলেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া সে কবাটের আড়ালে অপরাধীর মত দাঁড়াইল।

সীতাও তখন কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু এই আকস্মিক ব্যাপারটা যে অত্যন্ত বিসদৃশ ও ঘৃণার্হ হইয়া উঠিল, তাহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। দুইজনেই তাহারা, এমনি চুপ করিয়া আছে; এমন সময় বাহির হইতে মিসেস্ গুপ্ত ডাকিলেন, সীতা! সীতা কোথায় গেল!—এবং ঠিক তাহার পরক্ষণেই অর্গলবদ্ধ কবাটে করাঘাতের শব্দ হইল। সে করাঘাত যেন চতুর্গুণ কঠোরতা লইয়া সীতার হৃৎপিণ্ডের উপর পতিত হইল। কথা কহিবার—নড়িবার চড়িবার শক্তিটুকুও যেন আর তাহার রহিল না।

মিসেস্ গুপ্ত বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধ করাঘাত করিতে উৎপল আবার একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। সে তখন উপায়ান্তর না

দেখিয়া দ্বার খুলিয়া নিজে ঠিক মায়ের সাম্‌নে দিয়াই তীরের মত ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা প্রথমটা বিস্ময়ের আতিশয্যে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই একেবারে বজ্রাহতার মত নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের ভিতর বেশ অন্ধকার করিয়াছিল; কিন্তু তখনও তাহার ভিতর দিয়া সীতার অস্পষ্ট মূর্ত্তিখানা আবিষ্কার করিতে মিসেস্ গুপ্তের কষ্ট হইল না। তিনি কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া আলোর বোতাম টিপিয়া দিলেন। সেই উজ্জ্বল বিদ্যুতা-লোকে সীতার মুখখানা মুমূর্ষুর মত বিবর্ণ দেখাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর মিসেস্ গুপ্ত তাঁহার সাম্‌নের চেয়ারখানা নির্দ্দেশ করিয়া সীতাকে কহিলেন,—বোস এইখানে। সীতা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া গৃহকর্ত্রীর মুখের পানে চাহিল। সে দৃষ্টি স্থির, নিষ্কম্প, অর্থহীন। মিসেস্ গুপ্ত কহিলেন, শোন। তুমি ত শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী! আজকের এ কাণ্ড থেকে তুমি আমায় কি বোঝাতে চাও?

সীতা তেমনি ভাবে চাহিয়া চাহিয়া মাথা নত করিল। সে ইহার কি বোঝাইবে? অপরাধী ত সে নিজে নয়, তবে তাহারই নিকট কৈফিয়তের এ জুলুম কেন?...কোন রকমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সীতা কহিল—আমি কি বোঝাব?

গৃহকর্ত্রীর মুখখানা তাতিয়া লাল হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি যথাসম্ভব শান্তস্বরে কহিলেন—কি বোঝাবে? এর বোঝাবুঝি কি এতই শক্ত? দেখ, তুমি যতই নিজেকে বুদ্ধিমতী মনে কর, আমার

দৃষ্টি এড়াবার শক্তি তোমাদের কারু নেই ; তোমারও না, আর ঐ ছোঁড়ারও না ! ও আমার ছেলে, আর তুমিও আমার মেয়ের বয়সী ; আমার চোখে ধুলো দেওয়াটা তোমরা যত সহজ ভেবেছিলে, ঠিক তত সহজ নয়। তোমাদের চাল-চলনের ওপর আমি অনেকদিন থেকেই নজর রেখে আসচি।

সীতা চুপ করিয়া স্থাণুর মত বসিয়া রহিল। তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমস্ত পৃথিবীখানা যেন ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। মিসেস্ গুপ্ত কহিলেন—তোমাকে দেখে আমার আশা ছিল, যা'ই তুমি কর, তোমার নিজের অবস্থার সীমা লঙ্ঘন করে' তুমি চল্‌বে না। এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, উৎপল যা'ই করুক, পত্নী বলে' তোমায় কখনই সে গ্রহণ করতে পারে না !

সীতার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যুতের মত বেগে সে মুখ তুলিল ; ক্ষণেক স্থির অথচ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গৃহকর্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আপনি এ সব কথা কেন বল্‌চেন তা বল্‌তে পারি না। আমাকে যতই হেয় আপনি মনে করুন, আমারও একটা মর্য্যাদা আছে। উৎপলকে আমি স্নেহ করতুম ; কিন্তু আজ বুঝেচি, সে তারও যোগ্য নয় ! তার পত্নী হওয়াকে আমি সংসারের ভেতর সব চেয়ে দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি।—বলিয়াই সীতা হঠাৎ একেবারে চুপ করিয়া গিয়া মাথা নীচু করিল। যে কথাটা সে বলিতে চাহিয়াছিল, তাহা যে হঠাৎ এমন কঠিন এবং তীক্ষ্ণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা সে নিজেও ভাবে নাই।

সীতার এই অভাবনীয় স্পর্দ্ধার কথা মিসেস্ গুপ্তের নিকট একেবারেই অসহ্য বোধ হইল। সীতার মত এমন একটি অপরিচিতা যুবতীকে বিবাহ করা উৎপলের মর্য্যাদার পক্ষে একান্তই হানিকর হইবে, এই বিশ্বাসটাকে তিনি এত বেশী প্রশ্রয় দিয়াছিলেন যে, আজ হঠাৎ সেই সীতারই মুখে তাহার বিপরীত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বটে? পরে কি কতকগুলা ইতরের মত গালিগালাজ তাঁহার ঠোঁটের আগায় আসিয়া পড়িতে তিনি তাহা চাপিয়া গিয়া অত্যন্ত শ্লেষের সহিত কহিলেন, তাহ'লে এত বড় একজন রূপসী গরবিণীকে আমাদের এই নীচ ঘরে আটকে রেখে ত' বড়ই পাপ কচ্ছি আমরা? এও বোধ হয় তোমার বড় দুর্ভাগ্য যে, আমাদের কাছে চাকরী করতে হচ্চে!

সীতার মুখ পর্য্যন্ত উত্তর ঠেলিয়া উঠিল, নিশ্চয়! কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে সে তাহা চাপিয়া গিয়া শুধু গৃহকর্ত্রীর মুখের পানে চোখ তুলিল। অশ্রুভারে তাহার সে দৃষ্টি মুহূর্ত্তে ঝাপ্সা হইয়া উঠিল। অত্যন্ত নরম সুরে সে কহিল, আমায় মাপ্ করুন। এ বিষয়ে কোন কথা কইতে আমি আর রাজী নই। আর—

মিসেস্ গুপ্ত ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন, আর কি?

সীতা মুখ তুলিয়া কহিল, কাল সকালেই আমি যাতে এখান থেকে বিদায় নিতে পারি, সেই চেষ্টাই আমি করবো।

মিসেস্ গুপ্ত খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে মনে তিনি বোধ করি একটা স্বস্তিও অনুভব করিলেন যে, এ কুগ্রহ আপনা হইতেই বিদায়ের কথাটা পাড়িয়া তাঁহার কষ্টের অনেকটা লাঘব করিয়া দিল। অস্ফুটভাবে 'বেশ' বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

এবং তিনি বাহির হইতেই সীতা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজের বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

---

(৫)

পরদিন বেলা তখন আটটা বাজে। সীতা একেবারে প্রস্তুত হইয়া মিসেস্ গুপ্তর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, মা, আমি চল্লুম। গৃহকর্ত্রী কোনরূপ কথা কহিলেন না, বা তাহার দিকে একবার তাকাইলেনও না। সীতা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া চলিল। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সে বাড়ীর একজন দাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, বল্‌তে পার, বাড়ীতে আজ শোভাকে দেখ্‌চি নে যে? দাসী কহিল, কেন, দিদিমণিকে যে মা কাল রাত্রে মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে! আর তো আসে নি!

সীতা রুদ্ধ নিশ্বাসে একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বাহিরে তাহার জন্য একখানি ঠিকাগাড়ী তাহার ট্রাঙ্ক ও খুচরা দুই-একটা জিনিস লইয়া তাহার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল। সীতা আসিয়া ভিতরে উঠিয়া বসিতে কোচ্‌ম্যান্ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে মা?

সীতা কহিল, পটলডাঙ্গায়। চল, আমি দেখিয়ে দিচ্চি। কোচ্‌ম্যান সেলাম করিয়া কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল।

সীতা একান্ত নির্জ্জীবভাবে একটি কোণে বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত হৃদয়খানা যেন কেমন একটা অপরিচ্ছন্ন আর্দ্র কুয়াসায়

ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে কুয়াসা ভেদ করিয়া দুঃখসুখের কোন অনুভূতিই যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছিল না। শোভার জন্য তাহার মনখানা এক-একবার কাঁদিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু ভিতরের সে কঠিন শুষ্কতা নিঙড়াইয়া একটা ফোঁটা অশ্রুও তাহার চোখের কোণে জমা হইয়া উঠিল না। এমনি একটা নিষ্ফলতার বেদনা তাহার অন্তরকে বারম্বার পীড়ন করিতে লাগিল।

সোজা ট্রামের রাস্তা ধরিয়া গাড়ী উত্তর দিকে চলিযাছিল। হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া ঘোড়া দুইটা যেন খুব বেশী রকম বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। পাশের একটা গলি হইতে সারি সারি পাঁচ ছয়খানা গরুর গাড়ী বাহির হইয়া রাস্তাটা প্রায় আটক করিয়া ফেলিয়াছে। দুই পক্ষে বচসাও সুরু হইয়া গেছে। সীতা একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের পানে চাহিতেই তাহার নজর পড়িল—একটা বাড়ীর মাথার একখানা সাইনবোর্ডের উপর। সাইনবোর্ডে লেখা আছে,—

"বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'পূর্ণিমা' কার্য্যালয়।"

কতটা সময় যে সীতা নির্নিমেষ শূন্য দৃষ্টিতে সেই সাইন-বোর্ড খানার পানেই তাকাইয়াছিল, তাহা সেও জানিত না; হঠাৎ সমস্ত গাড়ী কাঁপাইয়া ঘোড়া দুইটা সেই পাথরের রাস্তা মুখর করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। চোখের পলকে পূর্ণিমা-কার্য্যালয় অদৃশ্য হইয়া গেল। সীতার মনে হইল, কিসের

একটা অদ্ভুত অবাস্তব অভিনয়ের উপর একখানা গাঢ় যবনিকা পড়িয়া গেল। যেন তাহারই অলস মোহটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সীতা ভাল করিয়া খাড়া হইয়া বসিল।

গাড়ী থামিল—একখানা সরু ত্রিতল বাটীর দ্বারে। ভিতরে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া সীতা ডাকিল,—ললিতাদিদি আছ নাকি গো?

কে গা? বলিতে বলিতে একটা যুবতী উপরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বেশ বেঁটে-খাট; গড়ন গোল-গাল; রং সীতার চেয়ে একটু কালো; মুখখানিতে যেন সর্ব্বদা একটা প্রীতির ক্রীড়া চলিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই মুখ একটা হাসির রক্তিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিয়া একেবারে দুই হাতে সীতার হাত ধরিয়া কহিল,—এস ভাই, এস।

সীতা হাসিয়া কহিল,—কিন্তু, শুধুই যে বেড়াতে এসেচি তা মনে কর্লে তো চল্‌বে না! ক'দিন যে এখন দিদির কাছে থাক্‌তে হবে, তা বল্‌তে পারিনে।

ললিতা সীতার সেই কোমল গণ্ডে একটা ঠোনা মারিয়া কহিল,—দুষ্টুমী হচ্চে বুঝি? নে আয়; সঙ্গে কিছু আছে? কৈ —বলিতে বলিতে সে বাহিরে আসিয়া কোচম্যানকে ট্রাঙ্ক ও বাকী জিনিষ কয়টা ভিতরে লইয়া আসিতে বলিল।

বেথুন কলেজে পড়িবার সময় এই মেয়েটার সহিতই সীতার সব চেয়ে বেশী আলাপ হইয়াছিল, এবং কি-এক অজানা সূত্রে

নিতান্ত পর হইয়াও তাহারা এতটা আপনার হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ললিতা একজন পাশকরা ধাত্রী। এই বাটীতে দুইখানি ঘর ও রান্নার জন্য একটী ছোট কুঠুরী লইয়া সে বাস করে। ঘর দুই-খানির ভিতর, একখানি শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়, অপরটি বসিবার ঘর। তাহার এই ছোট্ট সংসারটি সে সর্ব্বদা বেশ ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দেয়। এখনো সে বিবাহ করে নাই। সহরেরই কোন একজন যুবা ডাক্তারের সহিত তাহার বিবাহের কথা কিছুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাহা সম্পন্ন হয় নাই।

ঘরে আসিয়া সীতাকে কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া ললিতা কহিল, —তা, কাজটা এমন হঠাৎ ছেড়ে দিলি যে?

সীতা অন্যমনস্কে উত্তর দিল,—ভাল লাগল না ভাই!

ললিতা তাহার চাকরাণীকে ডাকিয়া দোকান হইতে খাবার আনাইবার বন্দোবস্ত করিতে সীতা আপত্তি তুলিল। ললিতা কহিল, না ভাই, তা কি হয়! আমি এর পরে রান্না চড়ালে তবে ভাত হবে। একটু কিছু খাও। চা'ও একটু তৈরী করি, কেমন?

সীতা হাসিয়া কহিল,—না দিদি, এরকম কর্লে আমি পারবো না! কুটুম-আসার মত ব্যস্ততা দেখালে আমায় কুটুমের মতই বিদেয় নিতে হবে।...আচ্ছা, তুমি বল্‌চ, যাহোক্ একটু মুখে দিচ্চি! তারপর দু'বোনে রান্না করিগে চল! তোমার আজ কোথাও বেরুবার তাড়া নেই বুঝি?

না ভাই, হাতে তেমন কাজ নেই। তবে বিকেলপানে

একবার বাগবাজার যেতে হবে। এক জমীদারের বউ মরা ছেলে প্রসব করে যায়-যায় হয়েছিল, অনেক কষ্টে বেঁচে উঠেচে।

বহুদিন পরে এই দুই সখীর সাক্ষাৎ। দুই জনেই যেন আপনা ভুলিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। সেই প্রভাত হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত রান্নাবাড়া, খাওয়া, গল্প-গুজবের ভিতর দিয়া সময়টা এমন ভাবে কটিয়া গেল, যেন সে একটা মুহূর্ত্ত মাত্র! বেলা চারিটা বাজিতে ললিতা চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল,—না ভাই, এবার উঠতে হোল! সত্যি বল্‌চি, আজকের এই কাজটুকুও যেন একটা মস্ত বাধা বলে মনে হচ্ছে! অথচ না গেলেও নয়; বউটা যেন একদিন আমি না গেলে ভয়ে লজ্জায় অস্থির হ'য়ে পড়ে!

সীতা বলিল—না ভাই, যাও; কাজ আগে, তার পর আর যা-কিছু!

ললিতা চলিয়া যাইতে সীতা একা সেই তক্তপোষের উপর আরও খানিকক্ষণ শুইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। এতক্ষণে —জীবনের এই একটি পরম সুখের দিনের এই আকস্মিক অবসানে —তাহার প্রাণটা যেন হাঁফাইয়া উঠিতে লাগিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন তাহার মনে সংসারের ভালমন্দ বা নিজের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই স্থান পায় নাই, তেমনি—যেন তাহারই ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ কোথা হইতে রাশি রাশি অলস চিন্তা ঘন কালো মেঘের মত তাহার সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। এবং সেই এলো-মেলো চিন্তার সমুদ্রের মাঝখানে একটা আলোকস্তম্ভের মত জ্বলিতে লাগিল,—সেই পূর্ণিমাকার্য্যালয়ের কথাটা! অনেকক্ষণ

সে ললিতার ঘরে ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া-বসিয়া কাটাইল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া জামা শাড়ী প্রভৃতি বদ্‌লাইয়া ঘরে তালা চাবি দিল এবং বরাবর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।...

না, এ তীব্র আকাঙ্ক্ষার দহন নীরবে সহ্য করিবার ক্ষমতা সীতার নাই! নিজের ভিতরেই সে এতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া শেষে বাধ্য হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।...পূর্ণিমা-কার্য্যালয় সেখান হইতে বড়-জোর মিনিট পাঁচের পথ। সীতা বাড়ীর সম্মুখের ফুট পাথে এদিক-ওদিক পায়চারী করিয়া হঠাৎ সেই সরু দরজাটা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দাওয়ায় উঠিয়াই দক্ষিণদিকের ঘরে দুইজন লোক একখানি টেবিলের দুইদিকে বসিয়া কি সব কাগজপত্র লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। সীতা ভিতরে আসিতেই লোকদুইটা যেন বেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। একজন সসম্ভ্রমে মাথা চুলকাইয়া কহিল—কি চান্?

এই সামান্য এবং অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নেরই আঘাত যেন সীতার বুকে খুব কঠিন হইয়া বাজিল। কোনরকমে নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল,—আজ্ঞে আমার ক'টা লেখা—

লোকটি তখন অতি সঙ্গোপনে একবার তাহার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া কহিল—ও, লেখা? তা, এইদিক দিয়ে ওপরে চলে' যান। সম্পাদক মশায় ওপরেই আছেন।

সীতা প্রদর্শিত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া চলিল। প্রতি ক্ষণে তাহার মনে হইতেছিল, এইখানেই বুঝি সে মাথা ঘুরিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়; কিন্তু জীবনের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় নাকি

তাহাকে পুড়াইয়া পাথর করিয়া দিয়াছে, তাই এ অবস্থাতেও সে কোনরকমে টলিতে টলিতে উপরে উঠিয়া একেবারে সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করিল।

একখানি চেয়ারে গৌরবর্ণ শীর্ণকায় সম্পাদক মহাশয় বসিয়া টেবিলের উপরকার কতকগুলা কাগজপত্র ঘাঁটিতেছিলেন। নবীন লেখক সম্প্রদায়ের অনেকেই আসিয়া সম্পাদকের সহিত প্রত্যহ দেখা করিতেন; তাহাতে তিনি যেন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহাদের কেহ হইলে হয়ত বা কাগজপত্র হইতে চোখ না তুলিলেও পারা যাইত; কিন্তু এখন তাহা সম্ভব হইল না। নিশানাথ বাবু চোখ তুলিয়া কহিলেন কি চান্? বসুন।

সীতার পা দুখানা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল; সে তাড়াতাড়ি পাশের চেয়ারখানায় নিজের দেহভার ন্যস্ত করিল। সম্পাদক ইতিমধ্যে একবার নিজের কাগজপত্র এবং একবার সীতার মুখের দিকে বিদ্যুৎ-দৃষ্টিতে চাহিতে-চাহিতে শেষে কহিলেন—কি চান্ আপনি?

সমস্ত বাক্‌শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াও সীতা যেন একটা কথাও কহিতে পারিতেছিল না। দারুণ স্বপ্নের ঘোরে মানুষের যেমন মনে হয়, কত কাজই সে করিতেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ঠিক নির্জ্জীবের মতই পড়িয়া থাকে; ঠিক তেমনই সীতার মনে হইতেছিল, সম্পাদকের এই প্রশ্নের একাধিকবারই সে উত্তর দিয়াছে, কিন্তু সে উত্তর তাহার কাণেও পৌছায় নাই এবং সম্পাদকও ঠিক তেমনি করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! অনেক কষ্টে

সে বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল—আমার একটা কবিতা—

কবিতা ?—ও, আপনার কি নাম বলুন দেখি ?

প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া সীতা যেন অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল—শ্রীমতী সীতা—

সম্পাদক ঘন-ঘন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার একটা কবিতা এই মাসেই আমাদের কাগজে ছাপা হয়েছে না ? আরো অনেকগুলো আমার কাছেই আছে। তা, মাসের মাস একটা ক'রে যাতে ছাপাতে পারি, তার চেষ্টা আমি কোর্‌ব।

আচ্ছা—বলিয়া সীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। এত অকস্মাৎ যে, সম্পাদক মহাশয় বেশ একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—আপনি আমাদের কাগজ পেয়েছেন কি ? পান্‌নি বুঝি ? আচ্ছা এই নিন্ গত দু'মাসের। তারপর মাসের মাস পাঠিয়ে দেব।

কম্পিতহস্তে কোনরকমে বই দুখানা মুড়িয়া লইয়া সীতা একটি ছোট্ট নমস্কার করিতে গেল, কিন্তু পারিল না। নিশানাথ বাবু কহিলেন,—আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন ? আপনার ঐ নামেই পাঠালে যাবে ত ?

তাঁহার এই শেষের কথাটায় যেন কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন শরের মত আসিয়া সীতার হৃদয় বিদ্ধ করিল। তাহারই যাতনা চাপিতে গিয়া সীতা বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ত আমার

নাম! বলিয়া আর কোন কথার অপেক্ষা না করিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে বরাবর নীচে নামিয়া গেল।

(৬)

ঘরে ঢুকিয়াই ললিতা বিস্মিত হইয়া কহিল,—ওমা, সন্ধ্যেবেলা এমন করে' উপুড় হ'য়ে প'ড়ে কেন রে ?

সীতা ধড়মড় করিয়া তাহার ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া কহিল—না ভাই, তোমার ঘরের মেঝেটি ভারী ঠাণ্ডা কিনা, বেশ ঘুম আসছিল ! উঃ কি গরমই পড়েছে !

ললিতা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল—একলাটি বসে' বসে' তোর বড় কষ্ট হচ্ছিল বুঝি ? এ বাড়ীর ওদিকের ঘরে আর একজন ভাড়াটে আছে,—সে সিকনাসের কাজ করে ; বেশ লোক, তাঁর সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ কলিনে কেন ?

সীতা অধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কি আলাপ কর্ব্ব ! আমার কেমন ভাল লাগে না !—ললিতা মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের পানে তীক্ষ্ণভাবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—সত্যি, তুই যেন কেমন হ'য়ে গেছিস্ ভাই ! পরে সীতার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল—একটা কথা বল্‌ব ?

সীতা কহিল - কি ?

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিল—কোন ব্যাধের ফাঁদে পা দিস্ নি ত ভাই ? সীতা কোন উত্তর দিল না দেখিয়া ললিতা কহিল—তা যদি দিয়ে থাকিস্, ত' সে ব্যাধের হাতে আত্মসমর্পণ করাই ভাল্ !

সীতা কহিল—ব্যাধ তুমি কাকে বলচ? পুরুষকে?

ললিতা কহিল—হ্যাঁ; পুরুষ অনেকটা ব্যাধের জাতই বটে। কিন্তু ঐ ভালবাসা জিনিষটাই হচ্চে আসল ব্যাধের ফাঁদ!—তুই কাউকে ভালবেসেছিস্?

সীতা জোর করিয়া হাসিয়া কহিল—বেসেচি; তোমায়! সেই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে ঘর করতে ছুটে এসেচি!

ললিতা হাসিয়া তার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—কি দুষ্টুই তুই হয়েছিস্!·· সত্যি তুই একটা বিয়ে কর্লে বেশ হয়!

সীতা কহিল—আর তুমি?

ললিতার মুখখানা ক্ষীণ লজ্জায় একটু যেন নুইয়া পড়িল। পুনরায় সে মুখ তুলিয়া সীতার একখানি হাত টানিয়া লইয়া কহিল—আমি? তা···সত্যি ভাই, আমি জড়িয়ে পড়েছি। তাই এখন মনে হয়, এ ফাঁদে পা দিযে অনর্থক নিজেকে মুক্ত কর্কার চেষ্টা করার চেয়ে ধরা দেওয়া ঢের ভাল! এর ভেতরেও একটা পরম সুখ আছে।

সীতা হাসিয়া কহিল—সত্যি নাকি? কি রকম শুনি না দিদি? ললিতাও হাসিয়া কহিল, মিথ্যে বলিনি বোন্। এই ভালবাসার ভেতরের সুখ দুঃখকে ওজন করে' বোধ হয় কেউ দেখে নি, দেখা যায়ও না। তবে সকলেই বলে, দুঃখটাই এর বেশী! কিন্তু ভাই, তাও যদি হয়, তাহলে এই দুঃখেরও এমন একটা মোহিনী শক্তি—এমন একটা যাদু আছে, যেটাকে অগ্রাহ্য করা ত চলেই না, বরং তারই কাছে পরাজয় স্বীকার করে' মনে হয়

একটা বিরাট জয়েরই গৌরব আসে। এমনি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি এ!

সীতা বিহ্বলের মত ললিতার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। এ সকল কথার কোনোটাই হয়ত' সে নিজের মনে স্বীকার করিতে পারিল না, তথাপি, ললিতাদিদির নূতন প্রেমোল্লাসিত হৃদয়ের এই আত্মবিস্মৃত উক্তিগুলি শুনিতে-শুনিতে সে যেন নিজের বুকের বোঝাটা অনেকটাই হাল্কা করিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আরো দুই চারিটা কথার পর ললিতা যেন হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া হাসিয়া কহিল,—বা-রে! আমিও পাগলের মত কি সব বকে' যাচ্চি, আর তুমি মনে-মনে বেশ হাস্‌চ, না? তুমি ভারী শয়তান!

সীতা অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—কেন ভাই! জীবনের মাঝে তুমি আজ একটা নতুন তত্ত্ব লাভ করেচ, আমি পারি নি। তা, তোমার কাছে একটু শুন্‌তেও কি দোষ?

ললিতা আদর করিয়া সীতার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—কেন, তুই পারিস্‌ নি কেন?—বরং তোর রূপ আছে, আমার নেই!

সীতা হাসিয়া কহিল, তবু ভাল, জগতে অন্ততঃ একজন আছে, যে আমায় রূপসী বলে!

ললিতা কহিল,—নে ভাই, দুষ্টুমী রাখ্‌! তুই বুঝি কুৎসিৎ? গায়ের রং খুব কটা হ'লেই বুঝি তাকে সুন্দরী বলে, নইলে নয়? কালোই না হয় একটু হোল; কিন্তু, তোর এই মুখখানি আর এই ছিপ্‌ছিপে গড়নটি কজন মেয়ে পেয়েছে বল ত?

সীতা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—থাম, থাম দিদি! পরে হাসিতে হাসিতে কহিল,—তুই ভাই পুরুষ হ'য়ে জন্মাস্ নি কেন, তাহ'লে তবু আমার একটা গতি হ'য়ে যেত'! ললিতা খুব জোরে সীতার গালটা টিপিয়া দিল।...

এইরূপে দিন দুই তিন কাটিয়া গেল। সীতা কহিল,—ললিতা দিদি! তুমি তো দেখ্‌চি দু'চার বছর চলে' গেলেও আমায় কিছু বল্‌বে না! কিন্তু, এম্‌নি করে' কতদিন যাবে ভাই?

তাহার কথার তাৎপর্য্যটুকু বুঝিয়া ললিতা কহিল,—কেন, তুই আমার খুব খাচ্চিস্ বুঝি? এই যদি তোর মনের কথা, তবে এখানে এলি কেন শুনি?

সীতা হাসিয়া ললিতার চিবুক ধরিয়া তাহার অভিমানক্ষুণ্ণ মুখখানি তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—ওগো, না, না! বাবা, একটা কথাতেই এত রাগ? কিন্তু ভাই, একটা কিছু আমায়ও তো করতে হবে! বিনা কাজে এমনি বসে' থাক্‌তে আমার আর একবেলাও ভাল লাগ্‌চে না!

কি কাজ কর্ব্বি?

সীতা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—কেন, আগে যা করছিলুম! ললিতা কহিল, তবে তাদের বাড়ী থেকেই বা ছেড়ে এলি যে?

তাদের সঙ্গে পোষাল না। পরে একটু থামিয়া সীতা কি যেন ভাবিয়া কহিল, কি জানি, হয়ত' বা ভুলও একটু করিছি! শোভার মত অমন ছাত্রী আমি আর কোথাও পাবো কি না

জানি নে!—শোভার সেই কচি মুখখানি মনে করিয়া সীতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ললিতা চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে সীতা কহিল, না ভাই, একটা কিছু করতেই হবে। যদি কল্‌কাতা সহর ছেড়ে যেতে পারি, তাহলেই যেন ভাল হয়!

ললিতা একবার তাহার মুখের পানে চাহিল; কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। সীতা কহিল, আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই, এক কাজ কর্লে হয় না? খবরের কাগজে যদি আমি এম্‌নি একটা বিজ্ঞাপন দিই যে, আমি কোন ছোট মেয়ের শিক্ষার ভার নিতে প্রস্তুত, তাহ'লে কেমন হয়?

মন্দ কি!

হ্যাঁ, তাহ'লে কালই দোব; কি বল? কোন ভাল ইংরিজি কাগজে দিতে হবে। তুমি ভাই একটু ব্যবস্থা করে' দেবে ত?

তার পরদিনই ললিতা উক্ত মর্ম্মে কয়েকছত্র বিজ্ঞাপন সহরের কোন ভাল ইংরাজী সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিল। পরে সীতাকে বলিল, তাহ'লে নিতান্তই তুই আমায় ছেড়ে চল্লি ভাই?

দূর, কোথায় কি! আমার তেমনি বরাতই কিনা যে, বিজ্ঞাপন দেখেই লোকে ছুটে আস্‌বে? আর যদিই ভাগ্যক্রমে কোথাও যেতেই হয়, শীগ্‌গীর তো আস্‌চি! বিয়ের খাওয়া থেকে তোমরা কিছু আমায় বাদ দেবে না তো?

ললিতা হাসিয়া কহিল,—তা দোব না! অবশ্য, যদি বিয়ে হয়!

সীতা কহিল,—কি রকম! এখনো 'যদি'? এবার সিমুলে

থেকে ঘুরে এসেই ডাক্তারবাবু কাজটা পাকা কর্ব্বেন, এই প্রতিশ্রুতিই না তিনি দিয়ে গেছেন ?

হ্যাঁ।

তবে ?—পরে গালে হাত দিয়া অত্যধিক বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—বাবা! এতই অবিশ্বাস! সে বেচারা বিশেষ কাজে দূরে গেছে বলেই তার প্রতিশ্রুতিটাকে এম্‌নি করে' অবিশ্বাস কর্ত্তে হবে ?

ললিতা হাসিয়া কহিল, না লো না, অবিশ্বাস নয়!...কিন্তু ভাই, পুরুষের মত খাম্‌খেয়ালী আর কেউ আছে কি ? সংসারে দেখ্‌চি ত, বিয়ের পরেই সব কত-কি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, তায় আবার তার আগের কথা!

এ কথার উত্তর আর সীতার মুখে জোগাইল না। কেন না, ললিতার কথাটা এবার তাহারই হৃদয়ের কোন্ গূঢ়তম তন্ত্রীতে ঘা দিয়াছিল। তাহারই বেসুরা ঝন্‌ঝনানিতে তাহার নিজের সব কথা—এমন কি মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকু পর্য্যন্ত কোথায় তলাইয়া গেল, আর তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

(৭)

আরো দিন দুই পরে সেদিন সকালে ললিতা কি একটা কাজে বাহির হইয়াছিল; সীতা একা বসিয়া-বসিয়া রান্নার কাজ করিতেছিল; এমন সময় চাকরাণী আসিয়া খবর দিল,—একটী ভদ্রলোক আপনার নাম করে' দেখা কর্‌তে চান দিদিমণি!

সীতা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ভদ্রলোকটীর কোন পরিচয়ই যখন জানিতে পারিল না, তখন কহিল,—আচ্ছা, আমি যাচ্চি। বলিয়া সে মুখ হাত ধুইয়া আধ-ময়লা শাড়ীখানা বদ্‌লাইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

ভদ্রলোকটী সীতার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি সীতাকে দেখিয়া একটু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া একটুক্‌রা কাগজ তাহার সাম্‌নে আগাইয়া দিয়া কহিলেন,-ও, আপনিই বুঝি কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা দিয়েচেন? তা, সেই জন্যই আমার আসা!

লোকটীকে লইয়া গিয়া সীতা উপরের ঘরে বসাইল। তাহার সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদের পানে একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে সীতা কহিল,—কোথায় আমায় পড়াতে হবে? আপনারই—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোকটী হাসিয়া কহিল,—আজ্ঞে না; আমারই মনিবের মেয়েকে। মস্ত জমিদার তিনি।

এতক্ষণে যেন সীতার কাছে ব্যাপারটা বেশ সহজ হইয়া আসিল। লোকটী বলিল,—বাবু বলে' দিয়েচেন, টাকা-কড়ির জন্যে আট্‌কাবে না। আপনাকে তাঁদের ওখানেই থাক্‌তে হবে।

সীতা কহিল,—মেয়েটী কত বড় ?

এই, বছর ১২।১৩ হবে আর কি! একমাত্র মেয়ে, বাবুর বড় আদুরে। সীতা কহিল,—তাহ'লে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান্। আর, কবে যেতে হবে ?

লোকটী তাহার জামার বুক পকেট হইতে একখানি জীর্ণ নোটবই বাহির করিয়া খুলিয়া বলিল,—এই যে ঠিকানাটা! বলিয়া একটুক্‌রা লেখা কাগজ বাহির করিয়া সীতার হাতে দিল। পরে খাতাখানা পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে কহিল,—তাহ'লে কাল সকালে আপনার এখানে আমরা গাড়ী পাঠিয়ে দিলেই আপনার আর কোন অসুবিধা হবে না ত ?

সীতা একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া কহিল,—না।

আচ্ছা, তাহ'লে কথা ঠিক রইল!—বলিয়া লোকটী নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল।

সে চলিয়া গেলে সীতার মনখানি যেন কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় অবসাদে ছাইয়া আসিতে লাগিল।···ইহাই তাহার জীবন! গত ছয়মাস ধরিয়া সে উৎপলদের সংসারে কত আপনার হইয়াই উঠিয়াছিল, একটা কথায় সমস্ত মমতার আকর্ষণ ছিঁড়িয়া আসিতে হইয়াছে; আবার এ আজ কোন্ একান্ত অজানা পারঘাটায় সে তার জীবনের এই ডিঙ্গা

খানিকে বাঁধিতে চলিল !···কি অনির্দ্দেশ্য জীবন-পথেই তাহাকে ছুটিতে হইতেছে ; কুল নাই, বাঁধন নাই, আশ্রয় নাই ; চারিপাশে জীবনের স্রোতগুলা নিতান্তই একঘেয়ে রকম ছুটিয়া চলিয়াছে। এই তরঙ্গহীন স্রোতের টানে তাহার এই ক্ষুদ্র ডিঙ্গাখানি ডোবেও না, ভাঙ্গেও না ! এ যে অসহ্য !···

বুকের নীচের বিপুল অবসাদ যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া সীতার দুই অপাঙ্গে বাষ্পাকারে জমা হইয়া উঠিল। আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সে পুনরায় রন্ধনশালায় চলিয়া গেল।

ললিতা বাড়ী ফিরিয়া কহিল,—ওমা, এ সব করেছিস্ কি লো ? এত রাঁধা-বাড়া তুই একা করে' ফেল্লি ? সীতা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—কেন বল দেখি ? পুরুষের মত পেটের সংস্থান করে' বেড়াতে হচ্চে বলে' বাঙ্গালী মেয়ের এই স্বধর্ম্ম থেকেও একেবারে বঞ্চিত হ'য়েচি নাকি ?

ললিতা হাসিল। সীতা কহিল,—একটা সংবাদ আছে ; শুভ কি অশুভ বল্‌তে পারিনে। তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাও, বল্‌চি।

ললিতা কাপড় বদ্‌লাইয়া পুনরায় যখন সীতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার সেই স্মিত মুখখানা সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আদর করিয়া সে সীতার কটি বেষ্টন করিয়া কহিল,—তবে বুঝি এবার ললিতা দিদিকে ছেড়ে যাবার ডাক এসেছে রে ?

সীতা কহিল,—হ্যাঁ দিদি, তাই। কিন্তু কেমন করে' যাবো,

তাই ভাবচি। তোমার কাছে এই ক'টা দিন যে কি সুখে কাটালুম, তা কেবল আমার অন্তর্যামীই জানেন। তোমার জন্যে এবার ভারি মন কেমন করবে।

ললিতা কহিল,—হ্যাঁ লো হ্যাঁ, মন কেমন কর্ব্বার জন্যে দায় পড়েচে!

সীতা কহিল,—কেন ভাই, আমি খুব নেমকহারাম বুঝি?—

যাঃ—!...তা কোথা হ'তে ডাক এসেছে শুনি?

ভবানীপুরে। কোন্ জমিদারের বাড়ী না কি বল্লে! কাল সকালে যেতে হবে।

কাল সকালেই? তা, জমিদারবাবুর নামটী কি?

সীতা কহিল,—তা বল্‌তে পারিনে। সে কথা জিজ্ঞেসা করতে আমার মনে ছিল না।

...বিদায়ের পূর্ব্বে দুই সখীর কথার আজ যেন আর শেষ হইতে চাহিতেছিল না। সীতা যাহা হউক নূতন সব সঙ্গী পাইবে, কিন্তু, এই কয়দিন এখানে আসিয়া সে ললিতার এই একটানা জীবনটাকে এমন রঙ্গীন এবং বিচিত্র করিয়া দিয়া গেল যে, ইহার পর এই নির্জ্জনতা ললিতার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিবে! এই বলিয়া ললিতা স্নেহের অনুযোগ করিতে লাগিল। সীতার দুই চোখ ভিজিয়া আসিল, স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। সে ললিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি ভাই, এ যাওয়ায় আমার একবিন্দু সুখ নেই। মনে হচ্চে, আমি যেন সুখের রাজত্ব ছেড়ে দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে ছুটেচি!

ললিতা কহিল,—ছিঃ, ওকি !···এ সংসারে তোরও আপনার কেউ নেই, আমারও নেই ! তবু, মেয়েমানুষ হ'য়েও তো আমরা স্বাধীনভাবে সৎপথে পয়সা উপার্জ্জন কচ্চি বোন্ !

সীতা চোখ মুছিল';—তাতো কর্চ্চি ! কিন্তু এর দরকারই বা কোথায় ছিল দিদি ? শুধু এই একটা পেটের জন্যেই ত' !—যে সংসারের কোন কাজেই লাগ্‌ল না, তার এই এম্‌নি করে' বেঁচে থাকারই বা প্রয়োজন কি,' সেইটেই আমি ভেবে পাইনি। অবশ্য, তোমার কথা আলাদা—

কেন, আলাদা কিসে ?

তা নয় ? আমার আর তোমার অবস্থার যে তুলনাই হয় না ভাই ! আজ না হ'ক, দু'দিন পরেও তুমি সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবে ; কিন্তু আমি ?—আমার এ জীবনের শেষ কোথায় ?

বলিয়া সীতা বাহিরের মেঘলা আকাশখানার পানে তাকাইয়া রহিল। ললিতা কহিল,—সীতা !

সীতা তাহার পানে চোখ ফিরাইয়া তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়াই বুঝিল, কি একটা কথা যেন সে ললিতার কাছে অসাবধানে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ! মুহূর্ত্তে সে যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ললিতা তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া কহিল,—তোর জীবনই বা এত দুঃখময় কিসে হোল, সুখের পথ তোর কাছেই বা জন্মের মত কেন বন্ধ হোল ভাই, আমায় বল্‌বি নি ?

সীতা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। কোনক্রমে মুখ তুলিয়া কহিল,—না ভাই, পারবো না। তবে, বল্‌বোই একদিন ; আজ—

নয়। আজ আমায় মাপ্ করো। বলিয়া সীতা হঠাৎ যেন অত্যন্ত দ্রুতপদে সেখান হইতে নীচে চলিয়া গেল।

পরের দিন সকালে একখানা ঘরের পাল্কীগাড়ী যখন ললিতার বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা দশটা বাজে। সীতা তাহার সামান্য জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিল। পূর্ব্বদিন যে লোকটী সীতার নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া গিয়াছিল, সে কোচবাক্সে বসিয়াছিল; নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার আর কোন জিনিষপত্র সঙ্গে নেবার নেই ত?

সীতা ঘাড় নাড়িল। গাড়ী ভবানীপুরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

একখানি সৌখীন ত্রিতল বাড়ীর সামনে গাড়ী আসিয়া থামিল। উপরের সেই লোকটী নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সীতার নামিবার অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইল। সীতা নামিয়া আসিলে লোকটী কোচম্যানকে তাহার জিনিষ-পত্র ভিতরে আনিবার আদেশ দিয়া সীতাকে পথ দেখাইয়া চলিল। দ্বিতলের একখানি চেয়ার-টেবিল-সাজানো ঘরে তাহাকে আনিয়া লোকটী কহিল,—এইখানে আপনি একটু বসুন ততক্ষণ, আমি বাবুকে খবর দিই গে।

সীতা কহিল,—মেয়েটী কোথায়?

লোকটী কহিল,—হ্যাঁ, তাকেও এই দিচ্ছি পাঠিয়ে! বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একখানি চেয়ারে বসিয়া-বসিয়া সীতা ঘরের আস্‌বাব-পত্র ও ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এম্‌নি করিয়া কাটিল।

বাড়ীখানা সীতার কাছে যেন বড় নিস্তব্ধ—বড়ই ফাঁকা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। প্রতিক্ষণে সে একটী চঞ্চলচরণা বালিকার আগমনের অপেক্ষা করিয়া-করিয়া নিষ্ফল হইল। একা বসিয়া-বসিয়া আজ শোভার কথাটা তাহার খুব বেশী মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে হয়ত অপর কোন নূতন লোক আসিয়াছে, শোভা তাহাকেও কি ঠিক তেমনি করিয়া 'দিদি' বলিয়া ডাকিয়া গলা জড়াইয়া আবদার করিতেছে!…উঃ, সেই স্নেহময়ী শোভাকে ছাড়িয়া আসিয়া সীতা তাহার বুকের একটা দিক একেবারেই খালি করিয়া দিয়া আসিয়াছে!

…কাহার পদশব্দ হইল। ভূত দেখিলে লোকে হঠাৎ যেমন চমকিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে মুমূর্ষুর মত বিবর্ণ হইয়া যায়, সীতা পিছন ফিরিতেই তাহার অবস্থাটা সেইরূপ হইল। তাহার পায়ের নীচে হইতে সমস্ত পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। যে ঘরে আসিয়াছিল, এই বিবর্ণ নারীর সাম্‌নে সে ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অস্বাভাবিক ভাবে মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছিল; হঠাৎ খপ করিয়া সীতার একখানা শীতল হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—নামটাই না হয় বদ্‌লেছ, কিন্তু চেহারাটা তো আর বদ্‌লাতে পার নি গৌরি!

সীতা নড়িল না, চড়িল না; ঠিক তেমনি পাষাণমূর্ত্তির মত স্তব্ধ ও হিম হইয়া বসিয়া রহিল। লোকটী সাম্‌নের একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতেই কহিল,—আমায় চিন্‌তে তোমার কষ্ট হচ্ছে না বোধ হয়? আমি

'পূর্ণিমা'র সম্পাদক নিশানাথ চৌধুরী, আর—আর এই ছদ্ম সীতার স্বামী।

…এই কথার পর ঘরের ভিতর বহুক্ষণ ধরিয়া যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল,—তাহার ভিতর বাতাসের একটা হিল্লোল পর্য্যন্ত যেন বহিয়া গেল না। আশ পাশের সমস্ত প্রকৃতি যেন অকস্মাৎ প্রলয়ের সূচনায় স্তম্ভিত হইয়া স্বামী স্ত্রীর এই অপূর্ব্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল! কতক্ষণ পরে তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিত না,—সীতা ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। তপ্ত রক্তরেখা তাহার হিমশীতল মুখের উপর ফিরিয়া আসিল। কথা কহিবার সমস্ত শক্তি যেন একত্র করিয়া সে কহিল,—কিন্তু, আমি এখানে কেন?—আমাকে এখানে কে আনিয়েচে?

নিশানাথ কহিল,—এ বাড়ী উপস্থিত আমার। আমিই আনিয়েচি।

—আপনি? কিন্তু—পরে হঠাৎ সে উন্নত মস্তক নত করিয়া কহিল,—আমি এসেছি এখানে চাকরী করতে!

নিশানাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া শুধু কহিল,—গৌরি!

কশাহতার মত সীতা উদ্ধতভাবে মুখ তুলিল। তাহার চোখের সে প্রখর বিদ্যুদ্দৃষ্টি নিশানাথের দেহের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সীতা কহিল,—গৌরী কে? পাগলের মত কাকে কি বল্‌চেন? সে ত' আজ সাত বচ্ছর হ'ল মরে' গিয়েছে!

নিশানাথের দেহের সমস্ত শক্তি যেন একটু একটু করিয়া

লোপ পাইতে বসিয়াছিল। নিজের অজ্ঞাতেই যেন তাহার মুখ দিয়া সীতার কথাটা প্রতিধ্বনিত হইল,- মরে' গিয়েছে—?

সীতা আরো দৃঢ়ভাবে চেয়ারে বসিয়া কহিল,—হ্যাঁ। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে যেদিন বাড়ীর গণ্ডী পার হয়, সেইদিনই তার মরণ! তাতে, দেহে তার প্রাণ থাক্ আর নাই থাক্, কিছু যায় আসে না। বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চুপ্ করিয়া থাকিয়া যেন আরো খানিকটা শক্তি টানিয়া লইয়া কহিল,—কিম্বা, সে গণ্ডী পার হওয়ার জন্যে দায়ী সে নিজেই হোক্, আর অপরেই হোক্!

নিশানাথের মুখে আর কথা জোগাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে কহিল,—কিন্তু, দোষ কর্লে তার ক্ষমার ব্যবস্থাও তো আছে! আমি যদি দোষ ক'রে থাকি, তাহ'লে আমার তরফ থেকে অন্ততঃ এটুকু আমি তোমায় বল্‌তে পারি, এমন সুযোগ আমি পাইনি, যখন আমি সে দোষের জন্যে ক্ষমা চাইতে পারি। আজ পেয়েছি।—বলিয়া সে যেন কিসের আশায় উজ্জীবিত হইয়া উন্মুখ ভাবে সীতার মুখের উপর দৃষ্টি তুলিল। কিন্তু চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সেই কমনীয় নারীমূর্ত্তি যেন পাষাণের মতই কঠিন হইয়া গিয়াছে; কারুণ্যের ছায়াঃ তাহার মুখে—চোখে এতটুকু নাই! নিশানাথের সমস্ত কথা—সমস্ত নীরব আবেদন অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিয়া সে শুধু কহিল—তাহলে দেখচি আমায় এখানে ডেকে আনা একেবারেই মিথ্যে!…অনুগ্রহ করে আপনার চাকরদের কাউকে একখানা গাড়ী ডাক্‌তে বল-বেন কি?

নিশানাথ কোন কথা কহিল না; মুখ তুলিয়া চাহিলও না। সীতা নির্ণিমেষ শূন্য দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। খানিক-ক্ষণ পরে যখন নিশানাথ মুখ তুলিল, তখন স্পষ্ট দেখা গেল, তাহার গাল বাহিয়া দুইটি অশ্রুরেখা অত্যন্ত নীরবে গড়াইয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি হাতের উল্‌টা পিঠে সে দুটি মুছিয়া লইয়া নিশানাথ কহিল হ্যাঁ, তা দিচ্চি।···একটা মহা অপরাধের পর আজ আবার এই যে অপরাধটুকু আমি কর্ল্ুম তোমার কাছে, তার জন্যে ক্ষমা পাবার ভরসাও আমার নেই। তবে যদি পারো,—ঐ সিঁথির সিঁদুরটুকুর সঙ্গে সঙ্গে সব স্মৃতিই যেমন করে ঘুচিয়ে দিয়েছ পার ত তেমনি করেই আজকের দিনের এই অপ্রীতিকর সাক্ষাতের কথাটাও হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দিও। বলিয়া সে টলিতে টলিতে ঝড়ের মত ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিসের যেন একটা ঘুমন্ত আবেগ সীতার বুকের ভিতর অকস্মাৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাধা দিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ক্ষীণ শক্তি সীতার জড় দেহখানা ঠেলিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই নিশানাথ অনেকটা দূরে গিয়া পড়িল।

মন্ত্রাহতার মত সীতা সেইখানেই বসিয়া রহিল; যেন তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া তাহারই পূর্ব্বজন্মের একটা অধ্যায় এইমাত্র অভিনীত হইয়া গেল! ভয়ে, বিস্ময়ে, সে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়া মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার চোখের সাম্‌নে হইতে কি একটা অসহ্য দৃশ্যকে আড়াল করিতে লাগিল। সেই সময় হঠাৎ একটা চাকর 'হায় হায়, সর্ব্বনাশ কি হ'ল!' বলিতে

বলিতে ঘরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া যাইতেই সীতার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল ; চাকরটাকে ডাকিয়া কহিল, কেন গো, কি হ'য়েচে ?

চাকরটা একটা হতাশ দুঃখের অভিনয় করিয়া কহিল, বাবু পড়ে' গিয়ে রক্তারক্তি হয়েছে ! বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি হা-হুতাশ করিতে-করিতেই চলিয়া গেল।...

---
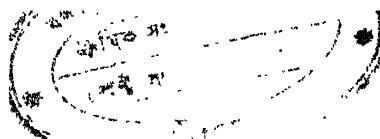
(৮)

কাঠের মত শক্ত এবং সোজা হইয়া সীতা দাঁড়াইয়া রহিল; বসিবার শক্তিটুকুও যেন রহিল না।

বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া সঞ্চিত, সীতার ভিতরের যে অবরুদ্ধ বিদ্রোহের ভাব অকস্মাৎ আজ শত ফণা বিস্তার করিয়া তাহার স্বামীকে আঘাতের পর আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ এই একটা বিসদৃশ ঘটনায় সীতা চকিত হইয়া দেখিল, সেই প্রবুদ্ধ বিষধরের দংশনে তাহার নিজেরই হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে। যে আঘাত সে এতক্ষণ করিল, তাহারই উদ্গীর্ণ জ্বালা-টুকু যে এখন তাহাকেই সহ্য করিতে হইবে, একথা কে যেন তাহার অন্তরে বসিয়া বারবার করিয়া বলিতে লাগিল। মনকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিল—কেনই বা এ দুর্ব্বলতা! এই দুর্ঘটনার জন্য তাহাকে ত কোনোদিক দিয়াই দায়ী করা যায় না!···কিন্তু সে কথা কে শুনিবে?—তাহার মনের কোন্ এক গভীর গহ্বর হইতে কে যেন অবিশ্রান্ত কাতর ধ্বনি করিয়া তাহাকেই অভিযুক্ত করিতে লাগিল। এ অভিযোগ কাটাইবার মত শক্তি সীতা কোন খানেই খুঁজিয়া পাইল না।

এই জয়-পরাজয়ের কথাটা যখন নীরবে—তাহারই নিজের মনে মনে এম্‌নি স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, তখন যেন একটা

গভীর লজ্জা আসিয়া সীতার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট করিয়া তুলিল। তাহার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সীতার অনেকখানি সময় লাগিল। এবং তাহার পরে সে যখন ধীরে ধীরে সেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সর্ব্বপ্রথম সম্মুখে পড়িল,— সেই চাকরটা। সীতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু কোথায়?

চাকরটা এতক্ষণে যেন সীতার পানে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। কি যেন একটা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া কহিল,—এই যে মা, এই ঘরে! আসুন্ না!—……

সীতা নীরবে দৃঢ় চরণে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

খাটের উপর নিশানাথ একা নিতান্ত স্তব্ধভাবে শুইয়া আছে। উন্মীলিত চক্ষুদুটী স্থির শূন্য দৃষ্টিতে উপরের বরগাগুলার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। সীতার গৃহপ্রবেশের কথা সে জানিতেই পারিল না। পরে যখন সীতা বরাবর আসিয়া তাহার খাটের উপর উঠিয়া বসিল,— তখন যেন সে সচেতন হইয়া মুখ ফিরাইল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কুণ্ঠিতের মত কহিল,—কি আশ্চর্য্য! এখনো এরা একখানা গাড়ী এনে দিতে পার্লে না!

মাথাটা তুলিতে তাহার কপালের উপরে চাপা-দেওয়া ছেঁড়া উড়ানী খানা খসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নীচের ক্ষতস্থান হইতে পুনরায় রক্ত ঝুঁজিয়া পড়িল। সীতা তাড়াতাড়ি ন্যাক্‌রাটা সেই ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—ডাক্তারকে কেউ খবর দিতে গেছে?

এই কথাটা সীতার মুখ দি নিশানাথ এক মুহূর্ত্তের জন্য ও বোধ

করি আশা করিতে পারে নাই, সে তাহার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। পরে মুখ ফিরাইয়া অতি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল,—ডাক্তার ? - ডাক্তারে কি কর্ব্বে এসে ?

সীতা নিতান্ত সহজ স্বরে কহিল, ডাক্তারের যা কাজ, তাই কর্ব্বে !

সেই সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবু, গাড়ী এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে নিশানাথ নির্ব্বাক অথচ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সীতার মুখের পানে চাহিল। সীতার মুখখানা অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, · আচ্ছা, ঐ গাড়ী নিয়ে তুমি একবার শীগ্গীর একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।··· দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও !

চাকরটা বার দুই সীতার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। নিশানাথ কহিল,— গাড়ী ফিরিয়ে দিলে, বাড়ী যাবে না ?

হয়ত এই সহজ কথার ভিতর নিশানাথের আঘাত করিবার কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি এইটুকু কথারই তীব্রতা যেন সীতার কাছে অসহ্য বোধ হইল। মুখখানা তাহার আকর্ণ রাঙিয়া উঠিল। দৃঢ়স্বরে কহিল,—গাড়ী ফিরিয়ে দিলেও একখানা গাড়ীর জন্যে আমার ফিরে-যাওয়া আট্‌কাবে না। সে ভয় তোমার নেই।

নিশানাথ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া কহিল,—কেন, আমার ভয়ের কথা এতে কি থাক্‌তে পারে !···গৌরি ! এ কথাটা তুমি কেন

এমন ক'রে ভুল্‌তে চাচ্ছ যে, আমি তোমার স্বামী, আর তুমি আমার স্ত্রী!

অনেক কথা একসঙ্গে সীতার অধরপ্রান্তে ভিড় করিয়া আসিল। কিন্তু সে সমস্ত ঠেলিয়া রাখিয়া শুধু কহিল—হ্যাঁ, আমি তোমার পতিতা স্ত্রী!

নিশানাথ একবার মাত্র নির্ব্বাক দৃষ্টিতে সেই মুখখানার পানে চাহিয়া তখনি তাহা নামাইয়া লইল। একটু একটু করিয়া সীতার আড়ষ্ট ভাবটা যেন একেবারেই কাটিয়া গিয়াছিল। কথার রাশি যেখানে এই দীর্ঘ কয় বৎসর ধরিয়া নীরবে জমিয়া উঠিয়াছে, সেখানকার রুদ্ধ দুয়ার এই অবসরে মুক্ত করিয়া দিবার লোভ সীতা যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিল না। অস্বাভাবিক রকম সামান্য একটুখানি হাসিয়া সে কহিল,—তুমি হয়ত মনে করচ, কত বড় বেহায়া মেয়ে আমি যে নিজের পতনের কথাটা এমনি সহজ ভাবে বল্‌তে এতটুকু দ্বিধা বোধ করচি নে! সত্যিই করচি নে। কেন না, এইটুকু স্বীকার ক'রে এখন আমার যতটা স্বস্তি, একথা অস্বীকার করে সে স্বস্তি আমি পাইনি।...এখানে সত্য মিথ্যার তুল-দাঁড়ি হাতে করে' বিচার করার মত মূর্খতা আর নেই!

নিশানাথ কি একটা কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিল; কিন্তু পারিল না। সীতা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল—যাক্, এখন ও সব কথা নিয়ে তোলাপাড়া না করাই সব চেয়ে ভাল। বুকের যেখানে ঘা, নিজে হাতে সেখানে খোঁচা দিয়ে দিয়ে রক্ত বার করে' কোন লাভ নেই। বলিয়া সে যেন সত্য সত্যই নিজের অন্তরের উদ্ধত

কথাগুলা নিবারণ করিতেই বুকখানা কে দুইহাতে চাপিয়া ধরিল।

নিশানাথ সহসা মাথা তুলিয়া একেবারে সীতার একখানা বাহু চাপিয়া ধরিয়া কহিল—না, চুপ করলে চল্‌বে না, তোমায় বল্‌তে হবে। আমার পাপের সমস্ত ইতিহাস আজই আমি শুন্‌তে চাই।...

বিস্ময়ের ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া সীতা কহিল—তোমার পাপ? বল কি? তুমি আবার কি পাপ করেচ? নিশানাথ মুখ তুলিয়া বলিল—কেন, তোমায় ত্যাগ—

সীতা কহিল—ত্যাগ? যা ঠিক তাই তো তুমি করেচ! আরো পাঁচজনে যা করত তাই তুমি করেচ—

এই কথার নীচে যে সুপ্ত শ্লেষ ছিল, তাহার ঝঙ্কারটুকু নিশানাথ ধরিতে না পারিয়া যেন উৎসাহের সহিত মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল—তবে? তবে কেন তুমি আমায় এম্‌নিভাবে দোষী করে রেখেচ গৌরী?

মুখের বিকৃতি করিয়া সীতা কহিল—কেন, তোমায় আমি দোষী করব কেন? বলিতে বলিতে একটা যেন তীব্র ঘৃণায় সীতার সারা অন্তরখানা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। মনে মনে সে একাধিকবার বলিতে লাগিল—দোষী এতে কে কাকে করতে পারে? কলঙ্কিতা স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি স্বামীর কাজই করেছিলে! এটা এত স্বাভাবিক এবং এত ন্যায়সঙ্গত যে, এর বিরুদ্ধে কথাটি বল্‌বার শক্তি কারু নেই—কারু হবে না!—হঠাৎ

তাহার বুকের একটা স্থানে মোচড় দিয়া তাহার দুটা চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নিশানাথ ভাবিতেছিল। এখন আপনার মনেই কহিল -- কিন্তু, আমার পক্ষ থেকে সাফাই গাইবার মত যত কিছুই থাক্, সত্যি বল্‌চি তোমায়, আজ পর্য্যন্ত যখনি তোমার কথাটা আমার মনে পড়েচে, কোন দিনই আমি নিজের মনে ঐ নির্দ্দোষিতার দোহাই দিয়ে শান্তি আন্‌তে পারিনি গৌরি!

সীতা কহিল—সে তোমার দয়া! কিন্তু থাক, এখন আর ও-সব আলোচনার প্রয়োজন আমি কোনোদিক দিয়েই দেখচি নে। তুমি যেখানে, তুমি সেইখানেই থাক্‌বে, আর আমি—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। চাকর ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু বসিয়া নিশানাথের মাথার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া সীতাকে কহিলেন একটু গরম জল চাই। আঘাত সামান্যই; ভাবনা নেই।

ঘরে ষ্টোভ ছিল, সীতা তাহা জ্বালিয়া জল গরম করিয়া দিল। ডাক্তারবাবু তুলা ও আইডিন দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিয়া দিলেন। পরে বলিলেন—ব্যাস্, আর এর কিছু করতে হবে না। তবে বেশ একটু বিশ্রাম দরকার। কেন না, শরীর দেখচি এঁর স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। আপনি এঁর—

বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সীতার পানে চাহিতে সীতা সে দৃষ্টির জ্বালা সহিতে পারিল না। তাহার মাথা আপনা আপনিই নত

হইয়া পড়িল। নিশানাথ তাড়াতাড়ি বলিলেন, ইনি আমার নিকট-আত্মীয়া।

ও, তবে আর কি! যাতে বেশ একটুখানি গাঢ় নিদ্রা যেতে পারেন, তারই ব্যবস্থা ইনি করে দেবেন!

নিশানাথ বালিশের নীচে হইতে একটা চাবির থ'লো বাহির করিয়া সীতার হাতে দিয়া জনান্তিকে কি বলিতে গেল, কিন্তু সীতা তাহা না শুনিয়া ডাক্তার বাবুর পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। পরে যখন সে পুনরায় আসিয়া বসিল, নিশানাথ জিজ্ঞাসা করিল—টাকার কি হ'ল?

কথাটা নিতান্তই তুচ্ছ, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া সীতা কহিল—চারটে টাকা আমার কাছেই ছিল, দিয়েচি।

নিশানাথ যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল,—সে কি? তোমার টাকা তুমি কেন দিতে গেলে? ঐ আলমারিতে যে- এই চাবি—বলিয়া সে চাবিটা সীতার হাত পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে যেন আল্‌মারি খুলিবার জন্যই নীরব অনুরোধ জানাইল। কিন্তু সীতা হাত গুটাইয়া লইল। কি জানি কেন অকস্মাৎ অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিতই সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, ওসব আমায় বলো না; আমি পারবো না।

নিশানাথ একটু থতমত খাইয়া গেল।···কেন যে সীতা তাহার আলমারি খুলিয়া নিজে হাতে টাকা বাহির করিতে চাহে না, ইহার সঙ্গত কারণ সে ঠিক খুঁজিয়া না পাইলেও সীতার মুখচোখের ভাবে তাহার অন্তরের কথাটা মোটামুটি ধরা পড়িয়া গেল। নিশানাথের

বুকের ভিতর একটা যেন অভিমানের গুমোট করিয়া উঠিল। সে নিজে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিতে গেল; সীতা বাধা দিয়া বলিল—উঠচ কেন? ডাক্তার কি বলে গেলেন, শুন্‌লে ত!

নিশানাথ কহিলেন—তাতো শুন্‌লুম; কিন্তু টাকাটাও যে বার করতে হবে!

সীতা কহিল—বেশ; টাকাটার জন্যেই বুঝি যত তাড়া!

নিশানাথ সোজা সীতার চোখের উপর চোখ রাখিয়া যেন বেশ সহজ স্বরেই কহিল, তা নইলে কেমন করে হবে! তুমি যখন আমায় এতখানি পর ভেবে আলমারী খুলে টাকাটা পর্য্যন্ত বার করে দিতে পারলে না, তখন আমিই বা কি করে' তোমার রোজগারের টাকা নিয়ে হজম কর্ব্ব বল!

ইহার উত্তর দিবার শক্তি বা ভাষা সীতার ছিল না। সে শুধু পাথরের মত অচল হইয়া বসিয়া রহিল। নিশানাথ চারিটি টাকা আনিয়া সীতার সামনে রাখিয়া দিয়া একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার পর দুজনেই অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরব। দুজনেরই মনে বোধ করি একই কথা তোলপাড় করিয়া উঠিতেছিল। দুজনেই হয়ত ভাবিতেছিল, এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানের পর আজিকার এই আকস্মিক সাক্ষাতে স্বামী স্ত্রী যেমন পরস্পরের অতি নিকটেই আসিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ এই একটা তুচ্ছ ব্যাপারে যেন তাহারা পূর্ব্বের চেয়েও আরো—আরো দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

ইহা অশুভ কিম্বা শুভ, তাহা বোধ করি কেহই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ সেই একই ভাবে বসিয়া থাকিয়া সীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশানাথ চকিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। কহিল,—একটু দাঁড়াও!

সীতা কহিল,—কি, বল!...

কি যে বলিবে তাহা নিশানাথ নিজেও জানিত না। সে কোন দিকে কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—যে জন্যে আজ তোমায় এখানে মিথ্যে করে' টেনে এনেছিলুম, তার কিছুই এখনো তোমায় বলা হয় নি।...আমার আশা ছিল, তুমি হয়ত আমায় ক্ষমা কর্ব্বে; আর—আর—

ইহার পরের কথাটা নিশানাথের মুখ দিয়া সহজে বাহির হইতে চাহিল না;—কিন্তু সীতা যেন সেইটুকুই অনুমান করিয়া লইয়া হঠাৎ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ক্ষমা?...এ সব কথা তুমি কেনই বা বল, তা আমি ভেবে পাইনি। তুমি স্বামী,—তোমাকে ক্ষমা করবার স্পর্দ্ধা আমার কোন কালেই হতে পারে না; এ কথা বোধ করি তুমিও স্বীকার কর।...না না, তোমার পায়ে পড়চি, তোমার আর অমন করে' ঐ ছাই-ভস্ম কথাগুলো কয়ে' এখন কাজ নেই। আমি চাকরকে বলে' যাচ্চি, যাতে—

তাহার এই অতি ব্যগ্র এবং দ্রুত কথাগুলা শুনিতে শুনিতে

নিশানাথ যেন কেমন একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—থাক্, আমি বুঝিচি গৌরি!—সে কথা বল্‌বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত তুমি আমায় দিতে চাও না! বেশ—বলিয়া সে যেন বুকের ভিতর হঠাৎ একটা নিরতিশয় যাতনা অনুভব করিয়াই বালিশের উপর নিজের মুখখানা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

সীতা মাত্র আর এক নিমেষের জন্যই তাহার পানে তাকাইয়া দেখিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

---

(৯)

ভাড়াটে গাড়ীখানা যখন একেবারে ললিতার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই প্রথম গাড়োয়ানের 'মা' সম্বোধনে যেন সীতার চেতনা ফিরিয়া আসিল। ভবানীপুর হইতে এই এতখানি পথ নির্ব্বিকার পাষাণমূর্ত্তির মত সে যে জায়গাটীতে বসিয়াছিল, একবারও তাহার একচুল পরিবর্ত্তন করে নাই। এতক্ষণ বর্ত্তমানের চিন্তা যেমন তাহার হৃদয়কে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতের কথাটাকেও সে তেমনি অবহেলায় দুই হাত দিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। শুধু অতীতের সেই স্মৃতির রাশি,—যাহাকে সে এতদিন পারতপক্ষে বড় একটা আমল দিতেই চাহিত না,—তাহাই তাহার হৃদয়ের প্রতি আনাচ-কানাচ যেন বন্যার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু, এক্ষণে তাহার দৃষ্টি যখন দ্বিতলে ললিতার ঘরের খোলা জানলাটার উপর পতিত হইল, ঠিক সেই সঙ্গে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথাটাই পুনরায় প্রবল বেগে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া দিল। গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে সে নিজেকে নিজে বারবার এই একই প্রশ্ন করিতে লাগিল,—বাড়ীতে ঢুকিয়া ললিতাকে সে কি বলিবে? সব কথাই যদি খুলিয়া বলে, তাহার ফল কি দাঁড়াইবে?

কিন্তু, এই সকল চিন্তার অবকাশ তখন অতি অল্পই ছিল। সুতরাং, তাহাকে কোনরূপ সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইল। তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে। ললিতা কলতলায় গা-ধুইতে যাইতেছিল, সম্মুখে সীতাকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সীতা কহিল,—কাজ শেষ করে' ওপরে এস, সব বল্‌চি—বলিয়া কোন রকমে ঘাড় গুঁজিয়া সে বরাবর সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।···

ললিতা গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সীতার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইতেই সীতা উচ্ছ্বসিত আবেগে একেবারে দুইহাত দিয়া তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—ললিতা দিদি, রাগ ক'রো না ভাই! এ সংসারে তুমি ছাড়া যে আমার আপনার আর কেউ নেই! তাই তোমাকেই আমি এম্‌নি করে' জ্বালাতন কর্‌চি।—বলিতে বলিতে কি-যেন একটা অব্যক্ত আকুলতায় তাহার মাথাটা ললিতার কাঁধের কাছে লুটাইয়া পড়িতে ললিতা গভীর স্নেহে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। পরে নিজে বসিয়া এবং তাহাকে ঠিক নিজের পাশটীতে বসাইয়া দুইহাতে তাহার মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—কি হ'ল, আমায় স্পষ্ট বল্ দেখি শুনি!

সীতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন নিজের এই মুমূর্ষু অবস্থাটাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিল। পরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—যারা কাজ দোব বলে' নিয়ে গেল, সত্যি তাদের ওখানে দেবার মত কাজ কিছুই নেই।

ললিতা বিস্ময়ের সহিত কহিল,—বলিস্ কি? তবে কেন এমন করে' মিথ্যে—

এতক্ষণে সীতা নিজেকে বেশ দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। কহিল—শোন। এই মিথ্যেটুকু বল্‌বার কারণ যে তাদের একেবারেই ছিল না, তাও নয়!…যিনি সে বাটীর মালিক তিনি আমাকে চেনেন্। শুধু যে চেনেন্ তা নয়,—তোমার কাছে আর কেন লুকোব বল,—তাঁরই সঙ্গে একদিন আমার বিয়ে হ'য়েছিল।…

এত বড় একটা বিস্ময়ের বার্ত্তা যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা ললিতা কল্পনাও করিতে পারে নাই; তাই সে একেবারেই নির্ব্বাক হইয়া শুধু সীতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষীণ হাস্যে অধর কুঞ্চিত করিয়া সীতা কহিল, তোমার কাছে এ ভারী আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে, নয়?…পরে ললিতার কোলের উপর নিজের হাতখানি রাখিয়া কহিল,—কাল তুমি কথায়-কথায় আমার জীবনের দুঃখের ইতিহাস জান্‌তে চেয়েছিলে; আজ সেই ইতিহাস বল্‌বার সময় এসেছে।

এই মেয়েটীর জীবনের যে সত্যই একটা ইতিহাস আছে, এবং সে ইতিহাস যে নিতান্ত সাধারণ নহে, এ কথা ললিতা এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিল।…সে শুধু বিহ্বলের মত কহিল,—কি হ'য়েচে শীগ্‌গীর বল্ ভাই!…

ধীরে-ধীরে সীতা বলিতে আরম্ভ করিল। যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

এই 'সীতা' নামটি তাহার মা-বাপের দেওয়া নহে ; তাহার নাম ছিল গৌরী। বাপ-মা গরীব ছিলেন ; সাত-আট বৎসরের মেয়ে রাখিয়া তাহার বাবা মারা যান। কোন রকমে সামান্য জমিজমা হইতে তাহার ও তাহার বিধবা মাতার অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘুচিত। তাহার বাবার গান-বাজনার বিশেষ ঝোঁক ছিল ; নিজেও একজন ওস্তাদ ছিলেন। তিনি গৌরীকে একটু-একটু করিয়া গান শিখাইয়াছিলেন এবং গ্রাম্য পাঠশালে পাঠাইয়া তাহার শিক্ষার পত্তনও করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন তাহার বয়স বারো বৎসর, সেই সময় তাহার বিবাহ হইল। তাহার শ্বশুরবাড়ীর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই স্বচ্ছল ; আর তাহার স্বামী—পিতামাতার একটীমাত্র সন্তান—সুশিক্ষিত। সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, রীতিমত একটা রূপসী কন্যাকে তাঁহারা বধূ করিয়া গৃহে আনিবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হইল না। গৌরীদের গ্রামেই তাঁহার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া স্বামী গৌরীকে প্রথম দেখেন। কি দেখিয়া তিনি ভুলিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন,- তিনি নিজের ইচ্ছাতেই গৌরীকে তাঁহার স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরীর জননী এমন জামাই পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন !···

দুইটা বৎসর তাহাদের কত সুখে কাটিয়াছিল, তাহার বিবরণ গৌরী আজ মরিয়া গেলেও দিতে পারিবে না! কিন্তু তাহার পরেই একটা ঘটনা ঘটিল। একদিন কলিকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গিয়া অভিনয়ান্তে গৌরী তাহার শ্বশুর

বাড়ীর সকলের নিকট হইতে হারাইয়া যায়।...তাহার স্বামী সঙ্গে ছিল না। সে নিজেদের কাহাকেও না দেখিয়া ভয়ে জড়-সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; উপরে মেয়েদের বসিবার জায়গা প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে; রঙ্গমঞ্চের আলোক-মালা প্রায় সব নিবিয়া গিয়াছে: এমন সময় একটী মধ্যবয়স্কা রমণী তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে সেও কাঁদিতে-কাঁদিতে সমস্ত বলিয়া ফেলিল।... রমণী বলিল, 'ওমা, তাতে আর কান্না কিসের গা? তোমাদের বাড়ী ঝামাপুকুরেই ত'?—তা আমার সঙ্গেই এস না,—কর্ত্তাকে বলে' আমি এখন তোমার শ্বশুরবাড়ীতেই পৌছে দেওয়াব!... পাগ্‌লী মেয়ে! এটুকুই যদি না কর্ত্তে পার্ব্ব মা, তবে আর...

এম্‌নি কত-কি সে বড়ই মিষ্ট মিহিস্বরে বলিয়া গেল। গৌরী পরম বিশ্বাসেই রমণীর সহিত তাহার গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। গাড়ীতে একজন পুরুষ ছিল, সে ঐ রমণীকে মা বলিয়া ডাকিতেছিল। সেই নিসুতি রাত্রে নির্জ্জন রাস্তা কাঁপাইয়া গাড়ীখানা যে কোন্ দিক দিয়া ছুটিয়া চলিল, তাহা বুঝিবার উপায় গৌরীর একবিন্দুও ছিল না। খানিকটা দূরে আসিয়াই তাহার যেন ভারী ঘুম পাইতে লাগিল। সেই রমণী আদর করিয়া তাহার কোল পাতিয়া তাহাকে সেইখানে শুইতে বলিল। গৌরী হাজার চেষ্টা করিয়াও যেন সেই সৃষ্টিছাড়া নিদ্রার আবেশ কাটাইতে পারিল না। জোর করিয়াই কে যেন তাহাকে সেই রমণীর কোলে শোয়াইয়া দিল। পরে সে জানিয়া-

ছিল, সে নিদ্রা নয়; সেই রাক্ষস-রাক্ষসী কি একটা ঔষধ তাহার নাকের কাছে ধরিয়া এমনি করিয়া তাহাকে অচেতন করিয়াছিল।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে আর কলিকাতায় নাই; বরানগরের একটা ছোট বাড়ীর একখানা ঘরে সে একা পড়িয়া আছে। সেই রমণী আসিয়া তাহাকে প্রাণ-ঢালা আদর করিয়া বুকে তুলিয়া বলিতে লাগিল,—এই ছোট বাড়ীখানি সে গৌরীর জন্যই কিনিয়াছে; এখানে তাহারা মা-বেটীতে বাস করিবে।··· গৌরীর তখন কি যে অবস্থা তাহা বর্ণনা করা যায় না; সে শুধু কাঁদিতেই লাগিল। রমণী আরো কি কতকগুলা বকিয়া বকিয়া শেষে যেন একটু বিরক্ত হইয়াই, ঘর হইতে চলিয়া গেল। গৌরী উঠিয়া দ্বারের; কাছে গিয়া বুঝিল, বাহির হইতে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে।...

সেই বাড়ীতে প্রায় একটা মাস ধরিয়া গৌরীকে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। ইহার ভিতর সে স্ত্রীলোকটা ক্রমশঃ গল্পচ্ছলে তাহার নিকট এমন সব কুৎসিৎ কথা উত্থাপন করিতে সুরু করিল যে, গৌরীর ভয়ে আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিত। একদিন সে রাগে অন্ধ হইয়া রমণীকে রাক্ষসী প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়াছিল; তাহাতেও মাগী হাসিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

হঠাৎ একদিন বাড়ীতে হাঁকডাক পড়িয়া গেল। গৌরী তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দেখিল, কতকগুলা লালপাগড়ী ও দুইজন খাকীর পোষাক পরা লোক সেই মাগীকে ও বাড়ীর যে দুইজন চাকর ছিল, তাহাদের বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। গৌরী সেখানে আসিয়া

দাঁড়াইতেই তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। একটু পরেই একদল লোক ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গৌরীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও একবার সেই ভিড়ের মধ্যে সে খুঁজিয়া দেখিল, স্বামীর পরিচিত মূর্ত্তি তাহার নজরে পড়িল না। ... ...

দায়রার বিচারে সেই স্ত্রীলোকটার পাঁচ বৎসর এবং পুরুষ দুইটার তিন বৎসর করিয়া কারাবাস হইয়া গেল। কিন্তু সে কি তুচ্ছ শাস্তি! সমস্ত জীবনব্যাপী যে দণ্ড তাহারা সেদিন এই নিরপরাধা মেয়েটার উপর দিয়া গেল, তাহার প্রতিকার কে করিবে?

ব্যারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যখন তাহাকে প্রথম বিচারের জন্য লইয়া যাওয়া হইল, সেদিন আদালতে কি ভিড়টাই না হইয়াছিল! কিন্তু অত লোকের ভিতরও গৌরীর সেই তৃষিত চকিত দৃষ্টি একখানি বাঞ্ছিত মুখের সন্ধান পাইল না। যখন প্রশ্ন উঠিল, মেয়েটি কোথায় থাকিবে, তখন ক্ষণেকের জন্য এজলাস নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। গৌরীর ঠিক পাশের একখানি চেয়ারে ঐ কোর্টের সব চেয়ে প্রাচীন এবং কৃতবিদ্য উকীল জ্ঞানপ্রকাশ বাবু বসিয়া বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিলেন; তিনি উঠিয়া হাকিমকে কহিলেন,—হুজুর হুকুম দিলে আমি আমার ঘরে মেয়েটিকে রাখিয়া দিই। আমার নিজের ছেলে মেয়ে বা স্ত্রী আজ আর কেহই নাই! যতদিন থাকিবে, ইহাকে আমি নিজের মেয়ের

চেয়েও যত্নে রাখিব। হাকিম পরম আনন্দের সহিত গৌরীকে আপাততঃ জ্ঞানপ্রকাশ বাবুর গৃহে থাকিতে হুকুম দিলেন।··· ···

সীতার চোখের কোণে স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত জ্বল জ্বল্ করিতেছিল; আঁচলের খুঁটে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া কহিল,—বাবার পরিচয় আর নতুন করে' তোমায় কি দোব, তুমি ত তাঁকে বেশ চিন্তে! মানুষের ভেতরেও যে দেবতা আছেন, তাঁকে দেখলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না।···হ্যাঁ, তারপর আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা। এই মাম্‌লা নিয়ে যে চারিদিকে এত হৈ-চৈ চল্‌চে, তা এ পর্য্যন্ত তাঁদের তরফ থেকে টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত আমি শুন্‌তে পেলুম না। আমি দিনরাত শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতুম। বিচারের জের মিটে গেলে আমি একদিন নিজে থেকেই মুখ ফুটে বাবাকে বল্‌লুম,—বাবা, আমি আমার শ্বশুরবাড়ীতে যাবো। তিনি একবার আমার মুখের পানে চেয়ে মাথায় তাঁর স্নিগ্ধ হাতখানি বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—হ্যাঁ মা, সেই কথাটাই আমিও ভেবেছি! কিন্তু, তোমার একা ত যাওয়া হয় না মা! চল, আজই আমি তোমায় সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যাই!

সেখানে গিয়ে কি হোল জানো ললিতাদিদি? শ্বশুর অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বাবাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলেন। বল্লেন—আপনি বুড়ো হয়েচেন, জাতেও হিন্দু। আপনি কি এটা আশাও করেন যে, ঐ বউকে নিয়ে আবার আমি ঘর সংসার করতে পারি! কোন্ শাস্ত্রের অনুসারে পারি দেখিয়ে দিন্ দেখি! এম্‌নি আরও কত কি! বাবা শেষ চেষ্টা করে বল্লেন—

আচ্ছা, তবু একবার আপনার ছেলের মতটা জানা দরকার। বাবাজীকে একবার ডাকান্ না ?···শ্বশুর রাগে আর কোন কথাই না বল্‌তে পেরে চাকরকে দিয়ে উপর থেকে আমার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন। চাকর এসে খবর দিলে,—তিনি তেতালার ঘরে শুয়ে আছেন, এলেন না। শ্বশুর শ্লেষের হাসি হেসে কি সব বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বেই বাবা আমার হাত ধরে' উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—চল্ মা, আমরা যাই।—

গাড়ীতে উঠে এসে আমরা দুজনের কেউ একটা কোন কথাই বল্‌তে পারলুম না। বাবার দু'চোখের জল তখন তাঁর শুক্‌নো গাল দুখানা বেয়ে আমার হাতের উপর ঝরে পড়ছিল। বাড়ী গিয়ে তিনি শুধু বল্লেন—মা, এ সংসার শাস্তি দিয়েই সুখ পায়, তা সে শাস্তি যত বড়ই অন্যায় হোক্! কিন্তু, যে সে শাস্তি মানুষের মত বুক পেতে সইতে পারে, তার গৌরবের সীমা থাকে না। আমার আশা আছে, আমার মা হয়ে তুমি সেই গৌরব অর্জ্জন করবে!

তারই দু'দিন পরে বাবা আমায় বেথুন কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন। আর নিজে তাঁর ব্যবসা ছেড়ে আমারই জন্যে কল্‌কাতায় এসে রইলেন।—কলেজে যাবার আগের দিন সমস্ত রাত্রিটা আমার কিছুতেই ঘুম হোল না। তখন আমার মনে হয়েছিল, সেই রাত্রিতেই আমি বুঝি পাগল হয়ে যাবো! —স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন আমি একে একে সমস্ত নির্ম্মূল কর্ব্ব বলে' প্রতিজ্ঞা করলুম। সেই রাত্রেই আমি আমার সিঁথির সিঁদুর

মুছে ফেল্লুম।—পরের দিন বাবার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে তিনিও যেন আমার এ বেশ দেখে শিউরে উঠলেন। কিন্তু কোন কথাই মুখ ফুটে বল্‌তে পারলেন না।—সত্যি বল্‌ছো দিদি! আজ তাই ভাবি, ঐ আগুণের শিখাটুকু মাথার ওপর থেকে মুছে না ফেল্‌লে কি আমি এই এতগুলো বৎসর এম্‌নি ভাবে কাটিয়ে নিজের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারতুম? বলিয়া সীতা চুপ করিল।

সমস্ত ঘরখানা নিস্তব্ধ হইল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বের বর্ণিত কাহিনীটা যেন একটা বিরাট তপ্তশ্বাসের মত তাহার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিল।

(১০)

ললিতা সীতার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, আয়, একটু ছাদে বসিগে। সীতা বিনা আপত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইতে যাইতে ললিতা যেন চেষ্টা করিয়াই অত্যন্ত লঘুভাবে প্রশ্ন করিল,—তাহ'লে তোমার মা—

সীতা কহিল,— হ্যাঁ, আমাকে চুরি করে' নিয়ে যাবার খবর শুনেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

পশ্চিমের আকাশে তখন আলোর মেলা ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিয়াছে; শুধু একটা ধূমল রশ্মি তখনো একখণ্ড মেঘের গায়ে জড়াইয়া একান্ত অলসভাবেই পড়িয়াছিল। এবং ঠিক তাহার মাথার উপর তৃতীয়ার চাঁদখানি রোগজীর্ণ শিশুর মুখের হাসির মত একটা ক্ষীণ আলো ছড়াইয়া দিতেছিল। দুই সখীতে নির্ব্বাক হইয়া এই আলোক-আঁধারে মেশা সান্ধ্য আকাশখানার দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে বিগত উৎসবের শেষ স্মৃতিটার মত গোধূলির সেই ধূমল রশ্মিটুকু আকাশের গায়ে মিলাইয়া গেল। ললিতা কহিল,—সীতা! তোর এই নামটি আজ আমার কাছে যত সত্যি লাগ্‌ছে ভাই, তত আর কোনোদিন লাগেনি। আজ আমার মনে হচ্চে, তুই সেই

জনকরাজার মেয়েরই দুর্ভাগ্যের খানিকটা নিয়ে এখানে নেমে এসেছিলি! বলিয়া সে বাহু দিয়া সীতাকে বেষ্টন করিয়া নিজের আরো নিকটে টানিয়া লইল। সীতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ললিতা কহিল,—কিন্তু বোন্, এতই যাকে ভালবাসতিস্, তাকে আজ এমন করে' কাছে পেয়েও ছেড়ে আস্তে তোর কষ্ট হোল না?

এবার সীতা কথা কহিল; বলিল, দুঃখ কষ্টের ওসব কথা আর তুলো না ভাই; কেননা ওদের কোনো অর্থই আমি এক্ষেত্রে দেখ্তে পাইনি।......হ্যাঁ, কাছে পেয়ে ছেড়ে এলুম। কেননা, ঐ ছেড়ে আসাটাই হচ্চে আমার কর্ত্তব্য! ...বল দিকি দিদি, কাকেই বা কাছে পেলুম! অতীতের কোন্ দিনে হয়ত' তাকে স্বামী বলে' দাবী কর্ব্বার অধিকার আমার ছিল! কিন্তু আজ?......তাই মনে হয়, আজ ঐ কাছে পাওয়াটাই আমার পক্ষে মস্ত ভুল!

ললিতা অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কিন্তু ভাই, তুই কথাটাকে যে দিক্ দিয়ে দেখছিস্, সে হয়ত তেমন করে' দেখেনি, আর তাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।...... সে যে এমন করে' মিথ্যে কথা বলে' তোকে নিজের কাছে নিয়ে গেল, তারও যেন একটা কিছু উদ্দেশ্য ছিল বলে' আমার মনে হচ্চে।

সীতা কহিল,—তা হয়ত' ছিল। হয়ত' আজ যদি আমি

আবার ভিখিরীর মত তার পাদুখানি ধরে' কেঁদে পড়্তে পারতুম, তাহ'লে যা আমি হারিয়েচি, তা ফিরে-পাওয়া আমার পক্ষে শক্ত হ'ত না। কিন্তু ঐ কেঁদে-পড়ার দাম এখন আমার কাছে যত বেশী, স্বামীকে ফিরে-পাওয়াতেও যে তার শোধ হয় না! বলিতে বলিতে যেন একটা নীরব অহঙ্কারে তার বুকখানা স্ফীত হইয়া উঠিল।

তাহার উত্তেজিত ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া ললিতা পরম স্নেহে তাহার মাথার উড়ো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল। পরে খুব মৃদু একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহ'লে আজকালকার এই যুগে মেয়েমানুষের দাবী-দাওয়া চুল-চিরে ভাগ করে নেবার জন্যই তুই উঠে পড়ে' লেগেছিস্ বল্?

সীতা হঠাৎ ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরে, মুহূর্তের জন্য যেন নিজের হৃদয়খানা যতটা পারিল, তলাইয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—নিশ্চয়। তুমি কি মনে কর দিদি, মেয়েমানুষের হৃদয়ে ভগবান্ ভালবাসবার এত বড় একটা প্রবৃত্তি দিয়েছেন বলেই তার আড়ালে থেকে পুরুষ যত খুসি আঘাত —যত খুসি অত্যাচার করে' যাবে? মেয়েমানুষও যে মানুষ, এই পরম সত্যি কথাটাকে উপেক্ষা করবার অধিকার তারা কোথা হ'তে পেলে! এ অধিকার আমরাই বা স্বীকার করব কেন?

ললিতা চুপ করিয়া রহিল। একটু থামিয়া সীতা আবার বলিতে লাগিল,—শ্বশুরবাড়ী থেকে যখন অম্নি করে আমায়

দূর হ'য়ে আসতে হল, তারপর থেকে বাবা আমায় এই 'সীতা' নাম ধরে ডাকতে লাগ্‌লেন। কিন্তু, ওই কথাটাই আমি হাজারবার করে' মনে-মনে বলেচি, তাঁর এই নামকরণ সার্থক হয়নি। যে সহিষ্ণুতা নিয়ে জনক রাজার কন্যা তাঁর স্বামীর সমস্ত অবিচার সহ্য করেও মনে মনে ব লছিলেন —'জন্মে জন্মে তোমাকেই যেন স্বামী পাই'—সে সহিষ্ণুতাকে আমি কোন মতেই প্রশংসা কর্‌তে পারিনে দিদি! এতবড় ভালমানুষ ছিলেন বলেই রামচন্দ্রও ঐ নিষ্ঠুর অবিচার কর্ব্বার সুযোগ পেয়েছিলেন!

ইহার পর দু'জনেই আর কোন কথা কহিতে পারিল না। প্রাণের যে অসহ্য বেদনা লইয়া সীতা এতবড় একটা কথা বলিয়া গেল, তাহারই সমস্ত উত্তাপ যেন সেখানকার বাতাসটাকে পর্য্যন্ত ভারী করিয়া তুলিল। সে বাতাসে যেন সীতারই নিশ্বাস আটকাইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল,—থাক্ দিদি, ওসব কথাগুলো অনর্থক টেনে বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এস নীচে যাই। বলিয়া যেন প্রবল উত্তেজনার বশে ললিতার পূর্ব্বেই সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

রাত্রে আহারাদির পর যখন দুই সখীতে পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া শয়ন করিল,. তখন সীতা ইচ্ছা করিয়াই এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই হইতে দিল না। ললিতা শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু সীতার চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র ছিল না। যে প্রসঙ্গটাকে সে এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াই বাধা দিয়া

রাখিতেছিল, এখন এই নিস্তব্ধ রাত্রে একা পড়িয়া পড়িয়া সে যেন নিতান্ত অলসভাবে তাহারই অতল চিন্তার তলে নিজের সমস্ত সত্ত্বাটুকু ডুবাইয়া দিল। কত শত প্রশ্ন এখন সে নিজের মনে-মনে সৃষ্টি করিয়া তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিল। ...তাহার বিবাহের সময় বা তাহার পরে ভবানীপুরের ঐ বাড়ীখানার কথা সে ত' কিছুই শোনে নাই! তখন তাঁহারা ঝামাপুকুরের বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। সে বাড়ীখানার কথা সীতার এখনো বেশ মনে পড়ে। তেতালার সেই ঘরখানির পাশে বড় বড় মাটীর টবে সেই দুটী বড় জুঁই এবং বেলার ঝাড়ে কত ফুলই না ফুটিত! দক্ষিণা বাতাসের সঙ্গে সেই ফুলের গন্ধ যখন পর্য্যাপ্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিত, তখন তাহারা দুইজনে সমস্ত প্রাণ দিয়া সেই সুরভির নেশায় তন্ময় হইয়া থাকিত। সে গাছদুইটা সীতার বড় প্রিয় ছিল। তাহার নির্ব্বাসনের পরও হয়ত আরও কতদিন তাহারা তেমনি করিয়াই ফুল দিয়াছে; হয়ত সে ফুলগুলি আপনি ফুটিয়া আপনিই ঝরিয়া গিয়াছে, কেউ তাহাদের সম্মান করে নাই!...নিজের এই ছেলেমানুষীতে নিজেই হাসিয়া সীতা ভাবিল, এই ছয়-সাত বৎসরের ভিতর মানুষেরই কত বদল হইয়া গেল, তাহাদের খোঁজ কে রাখিয়াছে!...সত্যই, তাহার নিজের এ কি নিদারুণ পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! কিন্তু কৈ, মনকে ত' সে বদলাইতে পারে নাই?—সেই প্রথম কিশোর বয়সের প্রত্যেক খুঁটিনাটি স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের কোন্ গুপ্ত কোণে এত দিন কপট নিদ্রায় নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, আজ

সুবিধা পাইয়াই তাহারা একে একে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিয়া বসিতেছে! আজ আর তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিবার মত শক্তি যে তাহার একবিন্দুও নাই!

সাম্‌নের খোলা জানালার ভিতর দিয়া নিকষ-কালো আকাশের গায়ে একটা খুব বড় নক্ষত্র যেন ঠিক সীতার সহিত চোখো-চোখি তাকাইয়াছিল। তাহার পানে তাকাইয়া তাকাইযা সীতা ভাবিতে লাগিল, ঐ একই নক্ষত্রের পানে এই একই সময়ে হয়ত' আরও দুটী ব্যথিত চক্ষু এম্‌নি নির্নিমেষে তাকাইযা আছে! হয়ত' এই রজনীর বিশ্রামটুকু হইতে ভগবান তাহাকেও এম্‌নি করিয়া বঞ্চিত করিয়াছেন! আসিবার পূর্ব্বে সে কি যেন বলিতে চাহিয়াছিল, সীতা বলিতে দেয় নাই। কি সে কথা?

...সীতা যতবার ঘুরাইযা ফিরাইযা তাহার স্বামীর বক্তব্যটা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল, প্রতিবার সেই একই কথা জ্বলন্ত সত্যের মত তাহার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিত চাহিল; কিন্তু সে তাহাকে সত্য বলিয়া আমল দিতে পারিল না। মনে মনে সে বলিল, না, এ তাহার নিজেরই অলস কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়!...আর যদিই তাই হয়, যদিই এতদিনের পর স্বামী তাহাকে নিজের জায়গায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করেন,—কেন সে তাহা লইতে যাইবে? যে একদিন সংসারের এই অগম্য বন্ধুর পথে তাহাকে একান্ত নিঃসহায় ভাবে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিল,—অগ্নিসাক্ষী করিয়া তাহার

জীবনের সমস্ত ভার মাথায় লইয়াও যে একদিন নিতান্ত অবহেলার সহিত তাহার সমস্ত দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল,—আজ এই যুগান্তরের শেষে, এই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের এক শান্তিময় উপকূলে দাঁড়াইয়া তাহার দয়া সে কেন লইতে যাইবে ? জীবনযাত্রার এই একটানা বাকী পথটুকু সে নিজের উপর ভর করিয়াই শেষ করিবে।—ভাবিতে ভাবিতে সে, যেন সেই অন্ধকারের ভিতরই কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিয়া গেল, ঠিক এমনি একটা ভঙ্গীমায় উঠিয়া বসিল। তাহার পরে কতটা সময় যে তাহার তেমনি বসিয়া বসিয়া কাটিয়া গেল, সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। শেষে সর্ব্বশরীরে একটা অবসন্নতা অনুভব করিয়া যখন ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল, তখন হৃদয়ও যেন শুষ্ক মরুর মত থাকিয়া থাকিয়া হাহাশ্বাস করিতেছে। বুকের নীচের প্রতি শিরা-উপশিরাটি যেন কি-এক অজানা বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। এবং সেই অবিশ্বাসী হৃদয়ের কোন্ নিভৃততম কোণে বসিয়া কে যেন একঘেয়ে ভাবে তার কাণে-কাণে বলিতে লাগিল,—আজ বাধা দিয়া সে তাহার স্বামীর যে উদ্যত কথাটাকে চাপা দিয়া আসিয়াছে, সে কথার তিনি কোনোমতেই এইখানেই নিষ্পত্তি হইতে দিবেন না! কালই হয়ত' কোন লোক—হয়ত স্বামী স্বয়ং আবার সেই বার্ত্তা বহন করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিবে।—এই কল্পনাটুকুর ভিতর কি যাদু ছিল কে জানে,—সীতার হৃদয়ের সমস্ত অভিমান, সমস্ত বিদ্রোহভাব চাপিয়া দিয়া যেন ক্ষতস্থানে

খানিকটা শীতল প্রলেপ বুলাইয়া দিয়া গেল ; এবং তাহারই অনির্ব্বচনীয় শান্তির নীচে সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন যেন ইহারই একটা প্রাণারাম অনুভূতি—সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাময় স্মৃতির মত তাহার হৃদয়খানা জুড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং, প্রভাত হইতেই সে কেবলি যেন কাহারও প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় কাটাইতে লাগিল। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই আশার এই ক্ষীণ আশ্বাসটুকুকে সে যেন রীতিমত দুই বাঁহু দিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী তো আসিলই না ; তাহার তরফ হইতে একটা চাকর পর্য্যন্ত সীতাকে কোন কথাই জানাইতে আসিল না।

পড়ন্ত সূর্য্যের সিন্দুর-রশ্মিতে সমস্ত আকাশ রাঙা হইয়া উঠিল। সীতা ছাদের এক কোণে দাঁড়াইয়া নিজের এই বিরাট ভুলটুকু ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিজের মনেই সে বলিতে লাগিল,—স্বামী যে আবার এই জিনিষটা লইয়া টানা-হেঁচড়া করিলেন না, সে ত সবদিক দিয়াই ভাল হইল। যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তাহাদের উভয়ের মাঝখানে ব্যবধান পড়িয়াছে, তাহার দুই পাশে দাঁড়াইয়া অনর্থক মাথা ঠুকিয়া ফল কি? প্রাচীর ত তাহাতে ধূলিসাৎ হইবে না, তাহারা উভয়েই রক্তাক্ত মুমূর্ষু হইয়া উঠিবে মাত্র !······

পিছন হইতে ললিতা কহিল,—সমস্তদিন কি ভাব্‌চিস্ বল্‌ত ?

সীতা মুহূর্ত্তমাত্র তাহার মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি

ঠোঁটে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—ভাব্‌চি, এমনি গোধূলি-লগ্নে কবে আমার দিদির বিয়ে হবে!

মরণ আর কি!··· চুলগুলোয় যে সন্নিসিদের মত জটা বাঁধ্‌তে চল্‌লো! আয়, একটু গুছিয়ে দিইগে!—বলিয়া একবার তাহার সেই দীর্ঘ এলো চুলগুলা নাড়িয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া নীচে টানিয়া লইয়া গেল।

ললিতা চুল আঁচ্‌ড়াইতেছিল; আর সীতার মনটাকে একটু-খানি হাল্কা করিবার জন্য এলোমেলো গল্প করিতেছিল। বেথুন কলেজ ছাড়িয়া সে যখন ক্যাম্বেলে ধাত্রী বিদ্যা পড়িতেছিল, সেই সময়কার হাঁসপাতালের দুই একটা কাহিনী সে বলিয়া যাইতেছিল; এমন সময় হঠাৎ সীতা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা ললিতা দিদি! আমিও এক কাজ করতে পারি না? আমি যদি সিকনার্স হই ত কেমন হয়?

ললিতা কহিল,—তা, মন্দই বা কি! বেশত! ঐ ত কামিনী দিদি এখানে রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের নার্স! দিন কতক তাঁর সঙ্গে হাঁসপাতালে দেখে শুনে এস না! তারপর আমিও মোটামুটি কতকগুলো জিনিষ শিখিয়ে দিতে পার্ব্বো!······

সীতা মহা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সত্যি, আমি তাই কর্ব্ব! তোমার কি বই আছে আমায় দেবে চল তো!

—তা দিচ্ছি!···ওমা! উঠ্‌ছিস্ কেন?

সীতা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল,—বাবা রে! তোমার এখনো হোল না!

বিনান' বেণীটাকে ভাল করিয়া আঁটিয়া কবরী বাঁধিয়া দিয়া ললিতা কহিল,—এই হয়েচে।—একবার আমার দিকে ফের্ দেখি! সীতা ঘুরিয়া ললিতার দিকে মুখ করিয়া বসিল। ললিতা একটা ছোট কৌটা তুলিয়া তাহা হইতে খানিকটা সিন্দূর লইয়া সীতার সিঁথির কোলে লেপিয়া দিল। ব্যাপার বুঝিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সীতার সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া আসিল। তাহার বাক্‌শক্তি প্রায় লোপ হইয়া আসিল। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া সে ললিতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। ললিতা কৌটা নামাইয়া রাখিয়া দুই হাতে সীতার মাথাটি জড়াইয়া ধরিয়া তার ললাট চুম্বন করিয়া কহিল,—তুই যাই কর্ আর যাই বল্ বোন্, তুই হিন্দুর মেয়ে! হিন্দুর মেয়ের এতবড় সংস্কারটাকে তুই কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারিবিনে।—

সীতা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার অবশ মাথাটা ললিতার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। এবং বুঝিবা তাহার অজ্ঞাতেই দুই চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার মত অজস্র অশ্রুপ্রবাহ সম্পূর্ণ নীরবে ললিতার কোলের উপর নামিয়া আসিতে লাগিল।

---

(১১)

তারপর প্রায় মাসদুই কাটিয়াছে। স্বামী স্ত্রীর আর একদিনের জন্যও সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। দীর্ঘ কয় বৎসরের পর সীতার হৃদয়ে যে দুর্ব্বলতা: আসিয়াছিল, তাহা নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই যেন সে মনকে আর পূর্ব্বের মত দৃঢ় করিয়া, কঠিন করিয়া বাঁধিতে পারিত না। তাছাড়া, সেদিন তাহার সিঁথির কোলে ললিতার ঐ সিন্দুর লেপিয়া দেওয়ার ব্যাপার লইয়া কেমন যেন একটা বিসদৃশ অনুভূতিকে সে কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে তীব্রভাবে অভিযুক্ত করিতে চাহিত এবং সে প্রাণপণে তাহার সাফাই দিত। এমনি একটা দ্বন্দ্ব যেন প্রতিনিয়তই চলিয়াছিল। যখন কিছুতেই সে পারিয়া উঠিত না, ক্ষতবিক্ষত দুর্ব্বল হৃদয়খানা চাপিয়া সে আপন মনে বলিত,—হে ভগবান্! দোষই যদি করে' থাকি, সে দোষের জন্য আমাকেই শাস্তি দিও। তুমি অন্তর্য্যামী, তুমিই জানো, তার একতিল অমঙ্গলের কথা আমি মনে আনিনি।—দুই চোখের জল তাহার গাল বাহিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িত।

আজকাল সকালে প্রায়ই সীতা কামিনী দিদির সহিত হাঁস-

পাতালে রোগীদের সেবা শুশ্রূষা দেখা শুনা করিতে যায়। এবং বাড়ীতে বসিয়া দুই একখানা মোটামুটি সহজ ডাক্তারী বই পাঠ করে। এই নার্সের কাজটা যেন তাহার দিন-দিন বেশ প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, এবং ভবিষ্যতে কবে সে নিজে হাতে রোগীর শুশ্রূষা করিতে পাইবে, তাহার কল্পনাটিও যেন তাহাকে ক্রমশঃই আরাম দিতেছিল।

* * *

হঠাৎ একদিন সাফল্যের রশ্মিপাতে তাহার এই কল্পনাটুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাত্রে ললিতা বাড়ী ফিরিতেই সেদিন সীতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে খবর দিল,—দিদি! আর আমি নিষ্কর্ম্মা নই। আমারও আজ এক রোগীর বাড়ী থেকে call এসেছে।

ললিতা হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল,—বলিস্ কি? কিসের রোগী?

যক্ষ্মা—।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ললিতার স্মিত মুখখানা মুহূর্ত্তে কালী হইয়া উঠিল। সীতা তাহা লক্ষ্য করিলেও যেন একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—নরেন বাবু বলে' এক ভদ্রলোকের স্ত্রী আজ মাস তিনেক হ'ল যক্ষ্মায় ভুগ্‌চে। শীগ্‌গীর তাকে চেঞ্জে পাঠান হবে। তাই আমায় সঙ্গে যেতে হবে। ফীয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি মাসে দেড়শো করে' চেয়েছি। ভদ্রলোক তাতেই রাজি হয়েছেন।

ললিতা কহিল,—তাহ'লে কথাবার্ত্তা সব পাকা করে' ফেলেচিস্ ? কিন্তু, কেমন করে' তা হবে ?

—হবে না ? কেন হবে না দিদি ? আমি পারবো না মনে করচ বুঝি ?

—না, তা মনে করিনি। বরং এ সব রোগীর কাছে খাটুনী ত কমই ! কিন্তু, এর বিপদ যে বড্ড বেশী ভাই !

বিপদ ? – বলিয়া সীতা যেন নিতান্ত তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া কহিল,—এসব কি ছেলেমানুষী কথা বল্‌চ ললিতা দিদি ? শক্ত অসুখের ভেতর বেশীর ভাগই ত ছোঁয়াচে ! সে দেখতে গেলে ত নার্সগিরি করাই চলে না !

ললিতা কহিল,—তা বটে ; কিন্তু যক্ষ্মার মত এতবড় ছোঁয়াচে অসুখ যে আর নেই ভাই !—না বোন্ কাজ নেই, তত সাবধান হ'য়ে থাক্‌তে হয়ত' তুই পার্ব্বিনি ! শেষে কি উল্টো বিপদ করে' বস্‌বি ?

এবার সীতা গম্ভীর হইল। কথাটা এদিক দিয়া সে বেশী তলাইয়া না ভাবিলেও ললিতার এই কথায় যেন তাহার রোখ চড়িয়া গেল। সে কহিল,—কি করে বস্‌বো ! আমাকেও যক্ষ্মাতে ধর্‌বে, এই ত বিপদের সেরা বিপদ ?—কিন্তু, তাতেই আমায় পেছ্‌পা হ'তে হবে ?—তা কখ্‌খনো হবে না, ললিতা দিদি ! এ কাজ আমি কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌বো না, তা তুমি যতই বল—বলিয়া সে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এইখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যই, ললিতা কোন মতে সীতাকে তাহার এ সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারিল না। বাধা পাইয়া পাইয়া সীতার এই ইচ্ছা ক্রমশঃই যেন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে ললিতা নিরস্ত হইল। সীতা নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল ;- এ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়িব না। আমার আবার ভয় কিসের? যক্ষার তীব্র বীজাণু আমাকেও যদি আক্রমণ করে, করিলই বা? এমন ত' সংসারে কেহ নাই, যে আমার এই রোগে তাহাকে আকুল হইতে হইবে! বরং এই প্রাণটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিবার এ একটা মন্দ সুযোগ নয়!—যদিই সেই বিপদ হয় আমি তো মরিয়া বাঁচিয়া যাই! ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন যেন বিদ্রোহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট প্রাণীর দিকে তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে যে নিশানাথ ছাড়া অপর কেহই নহে, সে কথা কিন্তু সীতা কোন মতেই স্বীকার করিতে চাহিল না।

* * *

সেদিন সীতাকে বিদায় দিবার সময় ললিতার দুটী চোখ আর কোনমতেই শুষ্ক রহিল না। সীতা হাসিয়া কহিল ;—আশীর্ব্বাদ কর ভাই ললিতা দিদি, যেন তোমার চোখের জলই সত্যি হয়! যেন—

ললিতা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল ;—কখ্‌খনো হবে না। মরণকে তুই যতই কাছে ডাক্, সে এত সহজে ধরা

দেবে না। এই আমি বলে' রাখ্‌লুম। বলিয়া আর চোখের জল সাম্‌লাইতে না পারিয়া আঁচলে তাহারই দুই বিন্দু মুছিয়া ফেলিল। সীতার বুকের নীচে মোচড় দিতেছিল; কিন্তু তথাপি সে হাসিতে লাগিল। * * *

বেলা ১০টার এক্সপ্রেস। গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না। তাহারা সকলে 'গিরিডি' যাইবে। রোগিণীর স্বামী নরেন্দ্রবাবু সীতাকে বলিলেন,—দেখুন, আমাদের দু'জনের দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই কর্লুম। আর, আপনার ইণ্টারে যেতে ত বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না?

সীতা হাসিয়া কহিল,—অসুবিধা কিসের? আপনাদের পাশের গাড়ীতে আমায় বসিয়ে দেবেন; কেন না, যদি রাস্তায় আবার হঠাৎ আমায় দরকার হয়ে পড়ে!

নরেন্দ্রবাবুর মনের কুণ্ঠাটুকু পরিষ্কার হইয়া যাইতে তিনি বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই!

তাহাই হইল। নরেন্দ্রবাবু সস্ত্রীক সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া পাশের ইণ্টার ক্লাসখানি সীতাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সে গাড়ীতে ভিড় নাই বলিলেও হয়! সীতা একান্তে একখানি খালি বেঞ্চ অধিকার করিয়া জানালা ঘেঁসিয়া বসিল। প্লাটফর্মের উপর দিয়া নানারকম জাতির স্ত্রীপুরুষ যাতায়াত করিতেছে। সীতা অন্যমনে তাহাই দেখিতে লাগিল। হঠাৎ যেন কেমন করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল;—এই যে সম্পূর্ণ নূতন সব লোকদের লইয়া সীতা তাহার জীবনের এক অভিনব অধ্যায় সুরু

করিয়া দিল, ইহাই তাহার এই অবজ্ঞাত নিষ্প্রয়োজন জীবন-যাত্রার মহাযাত্রা! নিষ্প্রয়োজন বটে, অথচ ইহারই রসদ যোগাইবার জন্য সে আজ পর্য্যন্ত কত দ্বন্দ্বই না করিয়া চলিয়াছে!···যেমন করিয়া হৌক, ইহার একটা পরিসমাপ্তি হইলেই যে সে এখন বাঁচিয়া যায়! যদি ইহজীবনের ওপারে সত্যই কিছু অবশিষ্ট থাকে, সে যে এক্ষণে তাহারই ঘনীভূত অন্ধকারের মাঝখানে সেই অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর সন্ধান করিয়া ফিরিতে চায়!

সীতা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ একটা রেলকুলি মাথায় একটা বড় চামড়ার সুটকেশ লইয়া দরজার হাতল ঘুরাইয়া বলিল;—এই যে, এখানে বাবু! সীতা চকিত হইয়া একটু পিছাইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাবু হাঁফাইতে হাঁফাইতে দরজার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—নে, শীগ্‌গীর! কিন্তু ঠিক তার পরমুহূর্ত্তেই বাবুটী ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, ওরে না না, এ গাড়ী নয়! বলিতে বলিতে যেন অত্যন্ত দ্রুতবেগে অন্য গাড়ীর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। কুলী বাবুর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বকিতে সুরু করিল। তাহারই দুর্ব্বোধ্য ভাষা নিস্পন্দ সীতার কাণে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। সীতা ধীরে ধীরে তাহার অবসন্ন মাথাটাকে নিজের বুকের উপর নত করিয়া দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

ট্রেণ ধরিবার তাড়াহুড়ার মাঝখানে এই এক অতি সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তের জন্য সহসা এই যে চারিটা চোখের মিলন হইয়া গেল, তাহাতে একের অপরকে চিনিতে ত' বাকী রহিলই না; উপরন্তু

সীতা যেন এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের তীব্র স্পন্দনটাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া সংযত করিতেও পারিল না।

ট্রেণ তখন হু-হু করিয়া মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে সীতা ঘাড় তুলিয়া কাপড়ের খুঁটে নিজের মুখ-চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া লইল। যেন, তাহার নিজেরই সন্দেহ হইতেছিল,—এই একটা আকস্মিক ঘটনায় তাহার মুখচোখে বুঝি কি একটা গভীর ছাপ বসাইয়া দিয়া গিয়াছে; সেটুকু মুছিতে না পারিলে গাড়ীর লোকগুলা হয়ত' তাহার সবটুকু দুর্ব্বলতাই ধরিয়া ফেলিবে। সে একটা কোণে ভাল করিয়া সরিয়া বসিয়া একখানি বাঙ্গলা উপন্যাস খুলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু, বাস্তবের প্রবল অনুভূতিগুলাই তখন তাহার বুকের নীচে এক বিরাট ঝটিকার সূচনা করিয়া তুলিয়াছে; উপন্যাসের পরিকল্পনা সেখানে আদৌ জমিতে চাহিল না। খানিকটা পড়িয়াই তাহার সমস্ত ওলোট পালোট হইয়া যাইতে লাগিল; সে বই মুড়িয়া রাখিল। অলসমনে ভাবিতে লাগিল;—তাহার নিজের জীবনের এই এতবড় উপন্যাসটা যে প্রতিনিয়ত জটীল হইতে জটীলতর হইয়া উঠিতেছে, এর পরিসমাপ্তি কতদিনে কোন্‌দিক দিয়া হইবে! মানুষের গড়া উপন্যাসের মত ইহারও যদি সবটা ছাড়িয়া শেষের দুইটা পরিচ্ছেদ সে দেখিয়া লইতে পারিত—!

ট্রেণের গতি মন্দ হইয়া একটা ষ্টেশনে থামিয়া পড়িল।

সীতা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, "শ্রীরামপুর"। যেন তাহার অজ্ঞাতেই তাহার দুইচোখ একবার প্লাটফরমের এদিক ওদিক ভাল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু তাহার পরে যখন তাহার বুকের নীচে হইতে একটা শুষ্ক নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, তাহারই শব্দে সীতা যেন চকিত হইয়া নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু ধরিয়া ফেলিল। সে বেঞ্চের একধারে সরিয়া বসিল। যেন কাহারো কাছে গায়ে-পড়িয়া এইটুকুই সে প্রমাণ করিতে চাহিল—মিথ্যা গো মিথ্যা, কাহারও সে খোঁজ করিতেছে না! -

ট্রেণ আবার ছুটিল। সীতা আবার উপন্যাস লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। পূর্ব্বের মত আবার সে বই মুড়িয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। নিজেকেই সে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল;—এই ট্রেণেই সে আজ কোথায় চলিয়াছে? কুলীর সহিত এই গাড়ীতে উঠিতে গিয়া পুনরায় সে পিছাইয়া গেল কেন? তাহাকে দেখিয়াই কি? যতই সে এই সকল প্রশ্নের একটা সোজাসুজি মীমাংসা করিয়া নিরস্ত হইতে চাহিল, ততই যেন কি একটা দুশ্ছেদ্য জালে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। শেষে মনে মনে সে এমনি করিয়া বিচার করিতে লাগিল,—কিন্তু, আমার উপর এ অভিমান কেন? অভিমান না বিরাগ? শেষেরটাই বাঞ্ছনীয়, কেন না, যেখানে প্রেমের সমস্ত বন্ধন বজ্র-পাতে চূর্ণ হইয়াছে, সেখানে অভিমান করিয়া লাভ কোথায়?···নিজের মনে এমনি নানা বিতর্ক করিতে

করিতে সে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় ট্রেণ আসিয়া চন্দননগরে থামিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় কে বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। এবং পরক্ষণে চামড়ার সুটকেশ হাতে লইয়া নিশানাথবাবু ভিতরে উঠিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সীতার বুকের নীচে তাহার হৃদয়খানা মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইল।

---

(১২)

প্রায় মিনিটখানেক নিশানাথ নীরব থাকিয়া পরে যেন জোর করিয়া হাসিয়া কহিল,—তাড়াতাড়িতে ভুল করে' সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়েছিলুম। এখন সে ভুলটুকু শুধ্‌রে নিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।...

সীতা জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল; কথা কহিল না। নিশানাথ একটু নীরব থাকিয়া একদিকের বেঞ্চে নিজের কম্বলখানা বিছাইয়া তাহার উপর বসিল। ইহার পর কি যে কথা পাড়িবে, তাহা সে কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ, এম্‌নি চুপচাপ বসিয়া থাকিতেও যেন তাহার বড়ই বিশ্রী লাগিতেছিল। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সে একেবারে বলিয়া ফেলিল,—কিন্তু, যাই হোক্, আজ ট্রেণের এই দেখাতে আমরা দুজনে দুজনকে রীতিমত চম্‌কে দিয়েছি—বলিয়া যেন সীতার মুখে সামান্য কিছু উত্তর শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সীতা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। সেই মুখখানির উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নিশানাথ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তাহার সমস্ত মুখখানা একটা অপরিস্ফুট হর্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সীতা তাড়াতাড়ি মাথা নামাইয়া লইল। লজ্জার অরুণিমা তাহার গণ্ডদুটী মুহূর্ত্তের জন্য

রাঙাইয়া তুলিল। নিশানাথ যেন কতকটা আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল,—এ আমি কখনো আশা করিনি —কখনো আশা করিনি!

সীতা এবার মুখ তুলিল। বলিল, কি?

নিশানাথ তাহার মুখের পানে আবার খানিকক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল,—আশা করিনি যে, আবার কোন দিন তোমায় এই বেশে দেখ্‌তে পাবো।

সীতা একটু ঢোঁক গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল,—কেন পাবে না? মানুষ জীবনে ভুল-ত্রুটি ক'রেই থাকে; সে ভুল আবার শোধরানো যায় ত!

নিশানাথের মুখখানা এবার পরম উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া ফেলিল,—তাতো আমিও বলি গৌরি! একটা ভুলের জন্যেই যদি গোটা একটা জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, তার চেয়ে দুঃখের বিষয় বোধ হয় আর কিছু থাক্‌তে পারে না!

সীতা মুখ ফিরাইয়া বসিল। তেম্‌নি ভাবে বসিয়া-বসিয়া সে যেন নিজের দুর্ব্বলতাটুকু সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিল। নিশানাথ বলিতে লাগিল,- ভুল—না, ভুল কেন, অপরাধ—তা সে যত বড় অপরাধই আমি আজ পর্য্যন্ত করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা পাবার অধিকার যে আমারও আছে, তা হয়ত' তুমিও অস্বীকার কর্‌তে পারো না গৌরি! একটু থামিয়া সীতার মুখে কোন উত্তর না পাইয়া বলিয়া উঠিল,—কথা কচ্চনা যে?

সীতা তেমনি জানালার বাহিরে তাকাইয়াই কহিল,—চুপ কর একটু! গাড়ীর লোকগুলো—

কি এক অসহনীয় আবেগের উত্তেজনায় নিশানাথের বুকের ভিতর তরঙ্গ উঠিয়াছিল। সে বলিল,—থাক্।...কেনই বা এ অনর্থক লজ্জা আমাদের গৌরি!—আমাদের সহজ দাবীটুকু আমরা কেন ছাড়্ব?

কি একটা কঠিন শ্লেষ সীতার অধর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ হইতে দিল না। তাহার বুকের রক্তপ্রবাহ যেন ক্রমশঃ অচল হইয়া আসিতেছিল। সে তেমনি স্তব্ধভাবে বসিয়াই কহিল,—কিন্তু একবারের ঝেড়ে-ফেলা দাবী আবার এত সহজেই অধিকার কর্ত্তে যাওয়া চলে না তো!

এই আঘাতটুকুও নিশানাথের বুকে কম বাজিল না। সে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া অত্যন্ত গাঢ়স্বরে কহিল;—তা চলে না বটে! কিন্তু, একে তুমি 'এত সহজে' কেমন করে' বল্‌চ? এতকাল ধ'রে আমরা—

প্রসঙ্গটা যেন সীতার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। বলিল, সে যাক্, ও নিয়ে কথা-কাটাকাটি আমি করতে চাই না।..

নিশানাথ যেন তাহার আবেগের মুখে একটা কঠিন বাধা পাইয়া চুপ করিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়াই আর কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। ট্রেণের দুইধারে মুখ করিয়া দুইজনে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।...

গাড়ী যখন দীর্ঘ পাড়ি দিয়া একেবারে বর্দ্ধমানে আসিয়া

হাঁফ ছাড়িল, তখনও দু'জনের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। নিশানাথ জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া প্লাটফরমের এদিক-ওদিক চোখ বুলাইতে লাগিল। এবং খানিক পরে একটা ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে পান ও সিগারেট কিনিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। পরে একটু ইতস্ততঃ করিতে করিতে হঠাৎ সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া ফেলিল ; যদি মনে কিছু না কর, তাহ'লে—

কি—বলিয়া সীতা মুখ ফিরাইয়া তাহার কুণ্ঠিত মুখের অভিব্যক্তি ও হাতে পানের খিলিটা দেখিয়া যেন অসাবধানেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে সেটুকু সামলাইতে গিয়া বলিল,—পান? ওর চেয়ে ভাল পান আমার নিজের কাছে আছে।

নিশানাথের মুখখানা হঠাৎ অতিমাত্রায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই আবার গাম্ভীর্য্যে ঢাকিয়া আসিল। কিন্তু হাসি ও পরিহাসের এই হাল্কা সুযোগটুকু সে কোন মতেই ব্যর্থ হইতে দিতে চাহিল না। জোর করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল—তা কে জানে বল? তাহ'লে আমিই কি আর বাজারের কেনা এই পচা পানগুলো খেতে যাই?

ক্ষীণ লজ্জামাখা হাসিতে সীতার মুখখানি নত হইয়া পড়িল। একটা কৌটা হইতে গোটাদুই পান লইয়া সে নিশানাথের দিকে আগাইয়া দিল। নিশানাথ সে দুটী মুখে পুরিয়া কি যেন একটা সুখকর অনুভূতির নীচে নিজেকে তন্ময় করিয়া ফেলিতে লাগিল।

দুই চোখ যেন তার আপনা-আপনি মুদিয়া আসিল। পরে হঠাৎ সে কি বলিতে গিয়া চোখ খুলিয়া সীতার পানে চাহিতেই দেখিল, তাহার সেই দুটী ডাগর চক্ষুর সম্মিলিত দৃষ্টি তাহারই উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে। কি বলিতে গিয়াছিল, নিশানাথ ভুলিয়া গেল। বুকের নীচে তাহার সুপ্ত-সিন্ধুর মথিত গর্জ্জন শোনা গেল। তাহার আত্মহারা হইবার উপক্রম হইল। সীতা কিন্তু ততক্ষণে বাহিরে আকাশের পানে তাকাইয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল।...ইহার পর নিশানাথ কি করিয়া এবং কি বলিয়া কথা সুরু করিবে তাহাই লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় গাড়ীর দরজা ঠেলিয়া অপর একজন ব্যক্তি উঠিয়া পড়িতে দুই জনেই যেন চমকিয়া উঠিল। সীতা তাহাকে দেখিয়াই চিনিল। ব্যস্তভাবে কহিল,—কি হয়েচে?

নরেন্দ্রবাবু একবার নিশানাথের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—না, বিশেষ কিছু না। তবে জ্বরটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে গেছে। প্রায় ১০৩ হয়েচে।

ও! বলিয়া সীতা একটু চিন্তিতমুখে কহিল,—বোধ হয়, সেটা এই ট্রেণের পরিশ্রমের জন্যেই! কি করচেন এখন?—

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন,—ভাল করে' শুইয়ে দিয়েচি। না, এদিকে বেশ চন্‌মনে রয়েছে।...বিশেষ ভাবনার কথা নেই; কি বলেন?

সীতা কহিল,—না না, ভয় কিসের? আমি যাবো কি?

—যাবেন? না, এখন আর তাড়াতাড়ি কি? দরকার হয়, পরের ষ্টেশনে গেলেই চল্‌বে। বলিয়া নরেন্দ্রবাবু

আর একবার নিশানাথের দিকে তাকাইয়া নামিয়া গেলেন। এবং ইহার পর সীতা বা নিশানাথ কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। ইতিমধ্যে বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ বর্দ্ধমানের প্লাটফরম হইতে বাহির হইল।…

নিশানাথ ধীরে ধীরে ডাকিল,—গৌরি!

সীতা মুখ তুলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে যে বিস্ময়ের একটা সূক্ষ্ম ছায়াপাত হইল, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নিশানাথ ফিরিয়া দেখিল, সে কাম্‌রায় তখন আর অপর একটা প্রাণী পর্য্যন্ত নাই; কেবল এক প্রান্তে এই দুখানি বেঞ্চে তাহারা দুজনে বসিয়া রহিয়াছে। এই সহজ ঘটনাটুকুতে নিশানাথও কম বিস্মিত হইল না। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে একেবারে সীতার সাম্‌না-সাম্‌নি আসিয়া বসিয়া বলিল,—বাবুটী কে গৌরি? উনি তো এই পাশের সেকেণ্ড ক্লাসখানায় রয়েচেন; আর, সঙ্গে বোধ হয় ওঁর স্ত্রী, না?

সীতা বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

নিশানাথ কহিল,—হাবড়ায় তাড়াতাড়িতে আমি ঐখানেই উঠেছিলাম কিনা! ওঁর স্ত্রীর অসুখ বুঝি? কি অসুখ গা?

হঠাৎ এই প্রশ্নে সীতা যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। সে নীরব থাকিতে নিশানাথ পুনরায় কহিল,—আর, তোমারই বা ওঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তুমি—

সীতা যেন এতক্ষণে নিজের বুকে যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিয়া নিয়া

বলিল,—হ্যাঁ; আমি ওঁদের সঙ্গেই গিরিডি যাচ্ছি, ওঁর স্ত্রীর রোগে সেবা করতে।

সেবা করতে?—চিন্তিত মনে কথাটার আবৃত্তি করিয়া নিশানাথ কহিল,—ও, তাহ'লে সিক্‌নার্স হিসাবে বল?...পরে একটু নীরব থাকিয়া যেন কিসের একটা ছোট-খাটো ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বলিল, - কিন্তু, এমন কি অসুখ ওঁর স্ত্রীর?

মুখ ফিরাইয়া সীতা কহিল, অসুখ শক্ত; যক্ষ্মা।

...অনেকক্ষণ নিশানাথ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং সীতার যেন আর তাহার মুখোমুখি চাহিবার সাহস পর্য্যন্ত হইল না।

তীরগামী ট্রেণ তখন বিরাট শব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিয়াছে। লাইনের ধারে ধারে সবুজ মাঠগুলি তখন রৌদ্রের প্রখরতায় যেন নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। স্থানে-স্থানে কোন একটা পড়া-জমীর উপর গরু-বাছুর প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তাহাদের ভিতরও যেন প্রাণের সাড়াটুকু অতি ক্ষীণ ভাবেই স্পন্দিত হইতেছে; বাহিরের সমস্ত প্রকৃতি এম্‌নি ম্রিয়মাণ, এম্‌নি স্থির! সীতা শূন্য দৃষ্টিতে ইহাই দেখিতেছিল, এবং বুঝি বা মনে-মনে নিজের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত ইহার সামঞ্জস্যটুকু মিলাইয়া লইতেছিল।

হঠাৎ নিশানাথের গলা শোনা গেল।—জেনে শুনেই তুমি এই ভয়ঙ্কর রোগে নার্স করতে চলেছ গৌরি! এর বিপদ যে কত, নিশ্চয়ই সেটা তোমার অজানা নেই!

সীতা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, না। কিন্তু, বিপদ দেখে চম্‌কে উঠলে ত এ পথ থেকেই সরে দাঁড়াতে হয়!

নিশানাথ সহজে ইহার উত্তর দিতে পারিল না। খানিক পরে হঠাৎ একেবারে সীতার একখানা হাত নিজের মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, তাতেই বা এমন ক্ষতি কি গৌরি!...

সীতার ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর কে যেন জোরে কশাঘাত করিল। মুহূর্তে তার মুখ-চোখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াই পুনরায় পাংশু হইয়া গেল। মাথাটা তাহার আপনা-আপনি বুক পর্য্যন্ত নত হইয়া পড়িল। হাতখানা সে তাহার স্বামীর বদ্ধমুষ্টি হইতে ছাড়াইয়া লইবে কিনা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিবার মত বিন্দুমাত্র শক্তি যেন আর তখন তার মনের ভিতর অবশিষ্ট রহিল না। শিথিল হাতখানা তাই ছিন্ন লতিকাটির মত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

নিশানাথ কহিল, এই না তুমি নিজেই বলছিলে যে—ভুলভ্রান্তি সকল মানুষেরই আছে! তবে এক ভুলের জন্য এতবড় শাস্তি তুমি আমায় কেন দিতে চলেছ? আমি যাই হই, একদিন তো তোমার স্বামী ছিলুম; একদিন তো—

সীতার মাথার ভিতর সব যেন ঘুরপাক খাইতেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তাহার সহিবার ক্ষমতা সাধারণ নারী অপেক্ষা ঢের বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। সে তাই এতবড় ধাক্কাটাও কোনমতে সংবরণ করিয়া আবার খাড়া হইয়া বসিল। ধীরে ধীরে

নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া সাধ্যমত সহজস্বরে বলিল, 'ও সব কথা বলচ কেন? তোমায় স্বামী বলে অস্বীকার আমি কেন কর্ব্ব? আর তোমাকে শাস্তিই বা আমি কেন দিতে যাব; সে অধিকারই বা আমি কোত্থেকে পেলুম?

ইহার সঠিক জবাব নিশানাথ জোগাইতে পারিল না। মাথা নীচু করিয়া কহিল, তার জন্মে অপরাধী তো আমি একশোবার!···সেদিনের পরও যদি তোমার কাছে এটুকু অজানা থাকে, তাহ'লে আজও বল্‌চি,—যতই তুমি সংসারে নিজেকে স্বাধীন এবং একলা বলে ভাবো, তবু এখনো একজন আছে, তোমার অমঙ্গল যার কাছে অতি বড় শাস্তির মতই বুকে বাজে!

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সীতার বুকের ভিতর নানারকমের অনুভূতি একসঙ্গে ঠেলাঠেলি সুরু করিয়া দিল। তাহার ভিতর হইতে একটাই কিন্তু সবচেয়ে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ঈষৎ বক্রহাসি হাসিয়া সে কহিল, কিন্তু এখন এত কথা মনে হয় কেন? আর কেনই বা এই মানুষটাই একদিন তাঁর বাড়ীর দরজায় নিজের স্ত্রীকে ভিখিরীর বেশে আস্‌তে শুনেও একবার চোখের দেখা দিতে পারেন নি? এ দুটোর কোন্‌টা সত্যি?

ভাঙ্গাগলায় নিশানাথ উত্তর দিল,—দুটোই সত্যি! এর কোনটাকেই তো আমি মিথ্যে বলে' উড়িয়ে দিতে চাইনি!··· কিন্তু গৌরি! আমার পক্ষ থেকে যে সামান্য দুকথা বল্‌বার

আছে, তাকেও অমন করে অগ্রাহ্য ক'রোনা। বাঙ্গালীর সমাজ, যা এতদিন ধরে' আমার অস্থিমজ্জায় শিকড় গজিয়ে উঠেচে, তাকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌বার ক্ষমতা ক'জনের আছে? তার ওপর, মা-বাপের হুকুম ঠেলে—

সীতার মুখে একটা তীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, তা সত্যি!—কিন্তু এর মধ্যে এই কথাটা ভেবেই আমার ভারি হাসি পায়, যার নিজের পায়ে ভর দিয়ে এতটুকু দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সেও আবার নিজের ওপর আর একটা প্রাণীর মরণ বাঁচনের ভার নিতেও পেছ্‌পা হয় না! অথচ, যাদের ভার তোমরা মাথায় তুলে নাও, তারা বড় নিশ্চিন্ত হ'য়েই তোমাদের মুখ চেয়ে থাকে। তারা জানে, সকল সময়ে সকল অবস্থায় তোমরাই তাদের রক্ষা কর্‌বে! —তোমায় আমি দোষ দিচ্চিনে; বাঙ্গালী ঘরের অধিকাংশ বিয়েই আজকাল এই ধারায় চলে আস্‌ছে। কিন্তু, তুমিতো স্বামী, বলে' দিতে পারো আমায়, এ বিয়ের অর্থই বা কি, প্রয়োজনই বা কি?—

নিশানাথ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল; শুধু গৌরী বলিয়াই নহে, এই তেজস্বিনী নারীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালার সমগ্র উৎপীড়িত নারীজাতি আজ উগ্রভাষায় এই অভিযোগ করিতেছে; এবং নিজে সে আসামীর কাঠগড়ায় উঠিয়া এই মিলিত অভিযোগের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

সীতা খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—

তোমরা বল্‌বে, সমাজের কাছে—বাপ মায়ের কাছে কর্ত্তব্য তো আছে! কিন্তু, দুদিক থেকে যখন দুটো কর্ত্তব্য মানুষকে টান্‌চে, তখন সে কি করে' বিচার কর্ব্বে যে তার ভেতর কোন্‌টে ছোট—কোন্‌টে বড়! সত্যিই আমি বুঝতে পারি নে; আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো, এসব সময়ে মানুষের কোন্ জিনিষটার ওপর বেশী লক্ষ্য করা উচিত?

নিশানাথ কম্পিত গাঢ়স্বরে কহিল,—গৌরি! তুমি কি মনে কর্‌ছ, এতদিনের ভেতর এসব কথা আমারো মনে হয় নেই? বছরের পর বছর আমি বাড়ীঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে বেড়িয়েচি; তবু কি আমি খোঁজ করিনি, তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ, কি কর্চ্ছ!

সীতা হাসিল; কহিল,—কিন্তু, এই খোঁজের উদ্দেশ্যই বা কি? যদিই তুমি আমার দেখা পেতে, তাহ'লে আবার কি এ কুলটাকে বাড়ীতে স্থান দেবার সাহসটুকু ছিল?

— তা হয়ত' তখন ছিল না। কিন্তু আজ—

—কি?

—আজ আবার তোমায় ফিরে পাবার জন্যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

সীতা যেন কিসের একটা আঘাত সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু আজই বা সমাজের ওপর—বাপ-মায়ের ওপর এ অত্যাচার কেন কর্ত্তে যাচ্চো?

নিশানাথ কহিল,— আজ আমার আবার সমাজ কি? বাবা-মা দু'জনেই মারা গিয়েছেন!

ও!—বলিয়া সীতা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, কিন্তু, তাঁরাও অনর্থক আমায় ত্যাগ কর্ত্তে হুকুম দেন নি! কলঙ্কিনী স্ত্রীকে তুমি—

নিশানাথ তাহার দুখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, বারবার ওকথা কেন বল্‌ছ? আমার বিশ্বাস আমার নিজের কাছে! আমি যাকে আবার ফিরে-পাওয়া জীবনের পরম সৌভাগ্য বলে ভাবতে পারচি, আমার কাছে সে কখনই কলঙ্কিনী হ'তে পারে না!

সীতার মুখে আর কথা সরিল না। কে যেন তাহার কঠিন হাত দিয়া তাহার মুখখানা সজোরে চাপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে তাহার উন্নত মস্তক নত করিয়া একান্ত নীরবে জানালার কাঠের উপর ঠেস দিয়া সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ এমনি করিয়া নীরবে কাটিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ একসময় চমকিয়া উঠিয়া সীতা দেখিল, স্বামীর একখানি বাহু তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে; অপর হাতখানি তাহার উপর ন্যস্ত।—এত নিকটে যে তাহারা কখন আসিয়া পড়িল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। নিশানাথ বলিল, তাহ'লে বল তুমি ফিরে যাবে? তোমার ক্ষমাটুকু হ'তে আমায় বঞ্চিত কর্ব্বে না? বলিয়া সে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিতে গিয়া তপ্ত অশ্রুর স্পর্শ অনুভব করিয়া কহিল, কাঁদ্‌ছ কেন?

সীতা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা

করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়চি, অমন ক'রো না! আমায় ছেড়ে দাও!

নিশানাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, তবে চল, ফিরে যাই!

—কোথায়?

—আমার ঘরে! তোমার শূন্য সিংহাসনে আবার তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাই! চল—বলিয়া সে সীতার একখানি হাত পীড়ন করিতে লাগিল। কিন্তু বারম্বার প্রশ্ন করাতেও কোন কথাই সীতার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। সে শুধু মূক হইয়া বসিয়াই রহিল। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ যখন সে মুখ তুলিল, নিশানাথ দেখিলেন, তাহার সেই আর্দ্র চোখের ভিতর দিয়া কিসের একটা দৃঢ়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সীতা বলিয়া উঠিল, না। তা কেমন করে' হবে! আমি গিরিডি যাচ্ছি, গিরিডিই যেতে হবে। তোমার এ কথা আমি আজ কোনমতেই রাখ্‌তে পারি না, আমায় ক্ষমা ক'রো! বাবা-মা থাকৃতে যখন তোমার এ সাহস হয়নি, বা আজ থাক্‌লেও হোত না, তখন কি করে আমি—

আর সে বলিতে পারিল না। এইটুকু বলিয়াই একটা প্রবল হাঁফ ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। এই আকস্মিক তীক্ষ্ণ আঘাতে নিশানাথের মুখের ভাব কিরূপ হইল, তাহাও সে চাহিয়া দেখিল না। বাহিরের পানে তাকাইয়াই বুঝিতে পারিল, মন্দগতি ট্রেণ একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিতেছে!

---

(১৩)

মাঠের ধারে একখানি মাঝারি রকম বাড়ী,—নাম 'নিভৃত-নিবাস'। গিরিডি ষ্টেশন হইতে বড়-জোর মিনিট দশের পথ।

সেদিন যখন নরেন্দ্রবাবু রুগ্না স্ত্রী বিভাবতী ও সীতাকে লইয়া সেখানে আসিয়া উঠিলেন, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রবাবুর কোন নিকট।ত্মীয় পূর্ব্ব হইতেই এখানে বাস করিতেছেন ; সুতরাং আয়োজন সমস্তই ঠিক ছিল। বিভাবতীর জ্বরটা তখন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল ; সীতা রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প গুজব করিল। এবং পরে তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট পাশের ঘরখানিতে আসিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। কিন্তু, সমস্ত দিনের এত ক্লান্তিতেও সে সহজে ঘুমাইতে পারিল না।...আজ ট্রেণে স্বামীর সহিত এই অভাবনীয় সাক্ষাতের সমস্ত কাহিনীটুকু সে নানা দিক দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। একটা যেন বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তাহার নিজেরই অন্তর হইতে বারম্বার তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল বলিয়া মনে হইল, কিন্তু, কিছুতেই সে নিজের অপরাধ বিন্দুমাত্র স্বীকার করিতে পারিল না। বারম্বার এই কথাটাকেই সে সাফাই স্বরূপ বলিতে চাহিল, ন্যায়-অন্যায় যাহা কিছু ঘটিবার ছিল, সে ত' ইহার বহু পূর্ব্বেই

ঘটিয়া গেছে! এখন—এখন যে তাহাদের উভয়ের পথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে! এবং সে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, নিশানাথ নিজে !...পরম গর্ব্বভরে সে আপনার হৃদয়ের হীন দুর্ব্বলতাকে কশাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল,—পুরুষ যদি তার আশ্রিতাকে এমন অবাধ স্বেচ্ছাচারে অসংখ্য বিপদের মাঝে ঠেলিয়া দিতে পারে, সেও দেখাইবে, সে আশ্রয়টুকু উপেক্ষা করিয়াও এ সংসারে তার নিজের জোরে দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা নারীরও আছে !......

সেদিন আকাশে বেশ একটু ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। খোলা জানালা দিয়া সীতা দেখিল, ভাঙ্গা চাঁদখানি তখন পশ্চিম আকাশে ডুবু ডুবু করিতেছে। তাহারই স্বপ্নময় আলোকে দূরে কি-একটা পাহাড় একখানা কাল যবনিকার মত স্থির হইয়া রহিয়াছে।...নিস্তব্ধ প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া সীতার মাথার ভিতরটা কেমন এক স্নিগ্ধ আলস্যে ভরিয়া আসিতে লাগিল। জানালা বন্ধ করিয়া সে বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, বুকের নীচে কোন্ এক স্থানে যেন কি-একটা ব্যথা কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। কোন-মতেই তাহাকে সে সরাইতে পারিতেছে না। · ···

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বাহিরে গরিমাময় প্রভাত কচি রৌদ্রের গরদ পরিয়া তরুণ ভক্তের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সীতা তাহাকে হৃদয় ভরা অভিনন্দন দিতে পারিল না। কিসের একটা গ্লানি যেন তাহার বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রভাতের সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। ধীরে-ধীরে সে

উঠিয়া কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া বিভাবতীর কাছে আসিয়া বসিল। নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,- জরটা খুব কমে গেছে। দেখুন না, এরই মধ্যে কাপড় চোপড় ছেড়ে তৈরী হয়েচে ; বেড়াতে যাবে।

সীতা সস্নেহে হাসিয়া বিভাবতীর কপালে হাত বুলাইয়া বলিল — তা বেশ তো! তবে, আজ্‌কে আর কোথাও বাইরে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। এই বাগানের ভেতরই একটু নিয়ে বেড়ান্!

নরেন্দ্রবাবু স্ত্রীকে লইয়া কম্পাউণ্ডের পূর্ব্বদিকস্থ ফুল বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন। সীতা রোগিণীর বিছানার চাদরটী ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া তাহার জন্য হর্‌লিকের জল ফুটিতে দিল। কিন্তু, এই নির্জ্জনতার ভিতর থাকিয়া তাহার মনখানি কেবলি এক চিন্তার ঘুর্ণীজলে পড়িয়া পাক খাইতে লাগিল। কল্যকার সেই পুরাণো কথা গুলাই যেন আজ অনেকখানি নূতনত্ব লইয়া সীতার বুকের নীচে ফেনাইয়া উঠিত লাগিল। গভীর উন্মাদনার মুখে আহত ব্যক্তি যেমন তাহার ক্ষতের যন্ত্রণাটা ভুলিয়া থাকে, এবং সেই উন্মাদনাটুকু কাটিয়া গেলে যেমন তাহার উপেক্ষিত ক্ষতস্থানটার বিষয় বেশী করিয়াই সজাগ হইয়া উঠে ; সীতারও যেন অনেকটা তাহাই হইয়াছিল। আজ সকালে উঠিয়া অবধিই যেন তাহার মনে হইতেছে, তাহার এই গ্লানি ভরা বুকখানার নীচে কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য ক্ষতস্থান হইতে নিরন্তর একটু-একটু করিয়া শোণিত ক্ষরণ হইতেছে। কোন মতেই সে তাহাকে সাম্‌লাইতে পারিতেছে না। নিজের উপর তাহার বড় ঘৃণা হইতে লাগিল। এতকাল ধরিয়া আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া সে কি শেষে এই দুর্ব্বলতাটুকু সঞ্চিত করিল? এতদিন

ধরিয়া বিশ্বের পুরুষ গুলার বিরুদ্ধে সে নিজের মনে যে বিদ্রোহের আগুণ জ্বালাইয়া তুলিতেছিল, ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তাহা এমন করিয়া নিবিয়া যাইতেছে কেন ?

কিন্তু, যতই সে চোখ রাঙাইয়া নিজেকে শাসাইতে থাকুক,—তাহার মনের কম্পাস ঠিক সেই একই দিকে ছুটিয়া চলিতে চাহিল।

মধুপুর ষ্টেশনে যখন তাহারা নামিয়া আসিল, নিশানাথ চুপ করিয়া শুইয়াছিল ; সে কাশীতে বেড়াইতে যাইতেছে। সীতা নামিবার আগে একবার কুন্ঠিতার মত যখন বলিল,—তাহ'লে চল্লুম। নিশানাথ তখন ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়াছিল ;—হ্যাঁ, এসো সীতা।—এই সম্বোধনটা যেন সীতার বুকে ঠিক কশাঘাতের মতই বাজিয়াছিল। সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াছিল ; নিশানাথের দুটী চোখের দৃষ্টি যেন শিশিরে ভেজা প্রত্যূষের মত ঝাপ্সা হইয়া উঠিয়াছে।...বিদায়ের এই মৌন-মুখর দৃশ্যটাকে সীতা যেন হাজার বিঘ্ন দিয়াও আড়াল করিতে পারিতেছিল না। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই একটা ব্যথা তাহাকে কেবলি বিঁধিতেছিল,—আর যাহাই হউক, অতখানি রূঢ় আচরণ সে কেন করিতে গেল ? তাহার বক্তব্য ত' সে সহজ এবং নম্রভাবে বলিলেও পারিত ! ফলতঃ, আজ আবার সে মনে মনে ট্রেণের সমস্ত কথাবার্ত্তা গুলা আলোচনা করিতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে নিজের অন্যায়ের পরিমাণই বেশী করিয়া আহরণ করিতে লাগিল। এবং তাহারই সঙ্গে একটা দুর্দ্দমনীয় আত্মগ্লানি তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর-প্রান্ত পর্য্যন্ত ভরিয়া ফেলিল।.........

বিভাবতী মুখে-চোখে তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল। নরেন্দ্রবাবু হাসিমুখে সীতাকে কহিলেন,—দূর থেকে পাহাড় দেখে যে খুসিই হয়েছে! জিজ্ঞেস্ করুন না?

সীতা স্মিতমুখে একবার এই স্বামী স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া বিভাবতীর কপালের উড়ো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে-দিতে কহিল,—আচ্ছা, সে এখন থাক্। এখন একটু কিছু খেয়ে নাও, তারপর দু'বোনে শুয়ে খুব গল্প কর্ব্ব, কেমন ভাই?

পরক্ষণেই কিন্তু সীতার মুখে কিসের একটা কাল ছায়া পড়িল। একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে মনে মনে বলিল,—হায়, এই স্বামী সোহাগিনী মেয়েটার এই কঠিন রোগ না হইয়া তাহার হইল না কেন? এ কী সৃষ্টিছাড়া নিয়ম বিধাতার? এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যে হতভাগিনী শুধু মরণেরই অপেক্ষায় বাঁচিয়া আছে বলিলেই হয়, নিয়তির এই শ্যেন দৃষ্টি তাহার উপর ত' একবারও পড়ে না!......

নরেন্দ্রবাবু অন্যত্র গেলে বিভাবতী কহিল,—হ্যাঁ ভাই, এখানে কি আমি সত্যি ভালো হব' মনে কর?

সীতা ঈষৎ চমকিয়া কহিল,—ভালো হবে বৈকি ভাই, ভালো হবে। দেখ দেখি, তোমার স্বামী তোমার জন্যে কত কষ্ট করচেন, আর তুমি ভাল হবে না?

বিভাবতী ক্ষীণ সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল,—তা সে ভাল হই আর না হই, ঐটুকুই আমার পরম লাভ!—এই সুখের মাঝখানে মরে' গেলেও বড় দুখ্যু নেই!—

সীতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—চুপ কর, ছিঃ!…তাহার দুটী চোখের পাতা যেন ভিজিয়া আসিতেছিল।

বিকালবেলা নরেন্দ্রবাবু ও বিভাবতী দক্ষিণ দিকের দাওয়ায় দুখানি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, সেই অবসরে সীতা একবার নিজে একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

সূর্য্য তখন ঘন শালবনের মাথার উপর দিয়া ক্রমশঃ নিজেকে লুকাইয়া ফেলিতেছিলেন। বহু দূরের পরেশনাথ পাহাড় সেই অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় গাঢ় নীল হইয়া উঠিয়াছিল। সীতা আন্‌মনে তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল। হঠাৎ খানিকটা পড়া-জমীর কাছে সে কোন কারণে চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল,—মাঠের ধারে দুইটী তরুণ-তরুণী হাসিতে হাসিতে পথ চলিয়াছে। সীতা দাঁড়াইতে তাহারাও তাহার দিকে চোখ ফিরাইল। যুবক মুহূর্ত্তমাত্র নির্ব্বাক এবং ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—এই যে, এখানে আপনি! নমস্কার!

সীতা পাংশু হইয়া গিয়াছিল। চিনিতে তাহার বাকী রহিল না যে, যুবক উৎপল ছাড়া আর কেহই নহে। সে হাত উঠাইয়া প্রতি-নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই উৎপল তাহার তরুণী সঙ্গিনীকে কহিল, এঁকে চেনোনা প্রীতি! ইনি আমাদের শোভাকে পড়াতেন, নাম, শ্রীসীতা দেবী; ভারী ভাল লোক। আর—বলিয়া সীতার দিকে ফিরিয়া বলিল,—ইনি মিঃ চ্যাটার্জ্জির ছোট মেয়ে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে আপনি দেখেন নি বুঝি? মস্ত একজন নামজাদা ডাক্তার!

সীতা একটু যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল,— বেশ।...শোভা কেমন আছে? অনেকদিন তাকে দেখিনি।...

উৎপল কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ: তার পর থেকে আর ত' দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি! বলিয়া একটু নীরব থাকিয়া কেমন এক অর্থপূর্ণ হাসিতে অধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, - কিন্তু, এই সময়-টুকুতেই দুপক্ষে রীতিমত পরিবর্ত্তন হয়েচে দেখচি! শুনলে বোধ হয় খুসী হবেন, প্রীতি আর আমি সম্প্রতি Engaged হয়েচি।...আপনি বুঝি এখানে আপনার স্বামীর সঙ্গেই এসেচেন?

সীতার মুখচোখ হঠাৎ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, মাথার এই সিন্দূররেখাটুকু উৎপলের নজর এড়ায় নাই। সে কোনরকমে নিজেকে সংবরণ করিয়া কহিল, না। পরে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া বলিল,—যাহোক, আপনাদের এই শুভ খবর শুনে ভারি সুখী হ'লুম। সুখী হোন্ দুজনে!

হঠাৎ কিছুদূরে দুম্ দুম্ করিয়া বন্দুকের মত গোটাকতক আওয়াজ হইতেই প্রীতি উৎপলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— ওকি হচ্চে?

উৎপল সেইদিকে তাকাইয়া দেখিল,—মধুপুর হইতে একখানা ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে। সে বলিল,—ও ঐ ইঞ্জিনের চাকার তলা হ'তে আওয়াজ হচ্চে,—fog signal!

বলিয়া একটু নীরব থাকিয়া কতকটা আপনার মনেই কহিল,—উঃ এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু বিপদের কামাই নেই! কি ট্র্যাজেডিটাই হ'য়ে গেল কাল!...

সীতা তার মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—কি হ'য়েচে?

উৎপল সবিস্ময়ে কহিল,—কেন, কাল্‌কের Train Disaster এর (ট্রেণ দুর্ঘটনার) কথা শোনেন্ নি? 5 up লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেস, যেখানা কলকাতা থেকে বেলা ১০টার সময় ছাড়ে, সেটা যে বক্সারের ওখানে derail হ'য়ে গেছে!

প্রীতি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, কত লোক মরেছে?

উৎপল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল,—কি জানি, সে কথা কি এখন টের পাওয়া যাবে! আর, ওসব খবর কখনো নাকি ঠিক পাওয়াই যায় না!

.........পশ্চিমাকাশ হইতে অস্তগামী সূর্য্যের খানিকটা রক্তাভা সীতার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; তাহা সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখের সেই মুমূর্ষুর মত বিবর্ণ ভাবটা যেন কিছু-মাত্র ঢাকা পড়িল না। তাহার পাংশু ঠোঁটদুখানা একত্র সংবদ্ধ হইয়া আপনা-আপনি স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্থির অথচ তীক্ষ্ণ নিস্পন্দ দৃষ্টিতে সে মুহূর্ত্তকাল উৎপলের মুখের উপর তাকাইয়া রহিল। পরে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় কম্পিতস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় খবর পেলেন?

উৎপল হাসিয়া বলিল,—সে কি? E.I.R. লাইনে এই ক'মাইল

দূরে এতবড় একটা দুর্ঘটনা হ'য়ে গেল, এর খবর কি আর চাপা থাকে? এ যে আগুণের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! —ওকি, অমন কচ্ছেন যে?

সীতা সসব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—না, এই শরীরটা আমার বেশ ভাল নেই। আমি এইখানে বসি একটু!...বলিয়া সে নিতান্ত শক্তিহীনার মত নিকটস্থ একখানা বড় পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া উৎপল যেন কেমন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল! কি করিয়া সীতার একটু সাহায্য করিবে তাহা লইয়া সে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় প্রীতি বলিল, বেলা হ'য়ে যাচ্চে; মা আবার—

প্রীতির গলার স্বরে উৎপল তাহার মুখের পানে চাহিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। প্রীতির সেই মুখের উপর একটা সুস্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—ও, মা ভাববেন? তা বটে! তাহ'লে চল, ফিরি!—বলিয়া একবার মাত্র অপাঙ্গদৃষ্টিতে সীতার দিকে তাকাইয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া প্রীতির সহিত চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে উৎপল নানা কথা কহিয়া প্রীতির মুখের লুপ্ত হাসিটুকু ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রীতি একটা কথা পর্য্যন্ত কহিল না। শেষে উৎপল অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিল, আমার ওপর রাগ কর্লে?...

প্রীতি মুখ না তুলিয়াই কহিল, না।...কিন্তু, আমি আজ

তোমার সঙ্গে না থাক্‌লেই বেশ হোত! আমার জন্যেই তোমায় তাড়াতাড়ি চলে' আস্‌তে হোল!

উৎপল প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া প্রীতির দুখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ছিঃ, আমার ওপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'য়ো না প্রীতি! ...আমায় ক্ষমা কর!

---

(১৪)

সেখান হইতে সীতা যখন নরেন্দ্রবাবুর বাটীতে পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এই পথটুকুই চলিয়া আসিবার মত শক্তি সীতা কোথা হইতে পাইল, এক্ষণে যেন তাহাই ভাবিয়া সে বিস্মিত হইতেছিল। তাহার নিজের জীবনীশক্তিটুকু যেন আর সে তাহার ভিতর অনুভব করিতে পারিতেছিল না। শুধু, অন্তরের দিকে দৃষ্টিচালনা করিয়া দেখিতেছিল,—যে ভীষণ ঝটিকা এতদিন তাহার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতেছিল, আজ তাহার অবসান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, বিশাল রণক্ষেত্র আজ পরিত্যক্ত মথিত অবস্থায় মৌন আতঙ্কের মত পড়িয়া রহিয়াছে।···এ ভীষণ শোচনীয় পরাজয় সীতা যেন কোনদিন একমুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করে নাই! * * *

বিভাবতী তাহাকে দেখিয়া কহিল, একলাটী কতদূর বেড়িয়ে আসা হোল ত'!

সীতা তাহার বিছানার পাশে বসিয়া কহিল,—না দিদি, কোথায় আর বেড়াতে যাবো!—তোমার দুধ খাওয়া হ'য়েচে ত!

হয়েচে।—বাবা! তোমাদের কাছে খালি ঐ খাওয়া আর

খাওয়া! জালাজালা দুধ গেলেই বুঝি আমি একেবারে ভাল হ'য়ে উঠ্‌বো?

এমন সময় নরেন্দ্রবাবু আসিয়া পড়িতে সীতা একটু সংযত হইয়া বসিল; বিভাবতী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। নরেন্দ্র-বাবু কহিলেন, জ্বরের অবস্থাটা দেখ্‌চেন? একদিনেই বেশ উপকার হ'য়েচে বলে' মনে হচ্চে।

বিভাবতী ধীরে ধীরে স্বামীর একখানি হাত নিজের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোথায় গিয়েছিলে?

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন, এই একটু ষ্টেশনের দিকে গিয়েছিলুম। সেখানে কাল্‌কের দুর্ঘটনার কথা শুন্‌লুম। বলিয়া সীতার দিকে মুখ তুলিয়া কহিলেন, উঃ কি ভয়ানক! শুনেছেন? আমরা যে গাড়ীতে মধুপুর পর্য্যন্ত এলুম, সেই গাড়ীখানাই বক্সারের ওখানে উল্টে গেছে!

সীতা ঠিক পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল; বোধ করি তাহার দেহের অণুমাত্রও স্পন্দিত হইল না।

নরেন্দ্রবাবু একটু নীরব থাকিয়া আপনার মনে কহিলেন, আচ্ছা, বক্সার এখান থেকে ক'মাইল হবে? জানেন আপনি?

সীতা জানিত না। তাহার মাথায় যেন হঠাৎ একটা তড়িৎ-রেখা খেলিয়া গেল। তাইত, বক্সার কতদূরে? কাশীর পরে নয় ত!······মুহূর্ত্তমধ্যে সে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিল, আমার ত' জানা নেই! আপনাদের এখানে যে Time table দেখেছিলুম!···বলিয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিয়া ট্রাঙ্কের

উপর টাইম-টেব্‌ল্‌খানা দেখিয়া নিজেই উঠিয়া গিয়া এমনভাবে সেটা তুলিয়া লইল, যেন সেই একটা সামান্য জিনিষের উপরই তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে! তখন যেন সে নরেন্দ্র বা বিভাবতীর উপস্থিতির কথাটা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল। নিজেই বইখানার পাতার পর পাতা উল্টাইয়া একটা স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল।···নরেন্দ্রবাবু কহিলেন, পেলেন না?

পেয়েচি। বম্বার থেকে কাশী অ-নে-ক-দূ-রে—বলিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই পারিল না। ···কোনরকমে বইখানা নরেন্দ্রবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া অপর ঘরে চলিয়া গেল।

···কিন্তু, বিভাবতীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে সীতা ফাঁকি দিতে পারিল না। খানিক বাদে সে যখন পুনরায় বিভাবতীর কাছে আসিয়া বসিল, তখন সে বুঝিতে পারিল, কোন কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও এই স্বামীস্ত্রীর মনের মধ্যে বেশ একটা সন্দেহের গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে।···বিভাবতীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের মুখে সীতা কিছুতেই আর প্রকৃত সত্যটুকু গোপন করিতে পারিল না।

উৎসের মুখের উপলখণ্ডগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে যাহা হয়, তাহাই হইল। সীতার চোখের জল তাহার শুষ্ক গণ্ডদুটা বাহিয়া অজস্র ধারায় বিভাবতীর বিছানা সিক্ত করিল।

বিভাবতী কহিল, ওমা, কি হবে তাহ'লে? আমি ওঁকে ডেকে বলি। আর কেউ নয়, স্বামী যে!—

সীতা পাষাণমূর্ত্তির মত বসিয়াই রহিল। নরেন্দ্রবাবু সব শুনিলেন, এবং সেই রাত্রেই তিনি ষ্টেশনে গিয়া বক্সারে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

বিভাবতীর নিকট হইতে সীতা যখন নিজের শয়নঘরে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। অবসন্ন দেহখানা সে সটান্ বিছানার উপর এলাইয়া দিয়া নির্জীব হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। এরূপ রেল-দুর্ঘটনার বার্ত্তা সে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু, সেই ভয়াবহ দৃশ্যটাকে সে কোনমতেই নিজের কল্পনার গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। সব ছাপাইয়া শুধু এই একটা খণ্ডদৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া তাহার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিতেছিল; রেল-লাইনের ধারে কোন্ পড়া জমীর উপর রক্তাক্ত মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া নিশানাথ যন্ত্রণাধ্বনি করিতেছে; সে কাতরতা জনহীন প্রান্তরের বুকের মাঝেই হাহাশ্বাস করিয়া যাইতেছে, কাহারও সাড়া মিলিতেছে না; হয়ত সেই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া-পড়িয়া সে সীতাকেই স্মরণ করিতেছে!…সীতা আর ভাবিতে পারিল না। বিশাল সমুদ্রতরঙ্গের মত কি একটা অব্যক্ত অনুভূতি যেন তাহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে বলিয়া মনে হইল। সে উঠিয়া বসিল। উত্তপ্ত চোখে-কাণে ভাল করিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া খানিক বাদে সে চিঠির কাগজ ও কালি-কলম বাহির করিয়া কলিকাতায় ললিতাকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল।

সংক্ষেপে শেষ করিতে গিয়া চিঠি এত দীর্ঘ হইয়া পড়িল যে,

তাহার কোন অংশ বাদ দেওয়া সীতার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে সে চিঠিখানি খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া বালিশের তলায় রাখিয়া দিল। এত কথা সে কি লিখিল, তাহা তাহার আর মনে পড়িল না; কেবল শুইয়া-শুইয়া সে ইহাই বিচার করিতে লাগিল; এ চিঠি কখন্ পৌঁছিবে, এবং ভাল হউক্, মন্দ হউক্, কতক্ষণে নিশানাথের প্রকৃত খবর বহিয়া ইহার উত্তর আসিবে! কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে খোঁজ করিলে নিশ্চয়ই ললিতা ঠিক খবর পাইতে পারিবে!···কিন্তু হায়, এ সম্বন্ধে কি সংবাদই বা সীতা আশা করিতে পারে?

* * * *

পরদিন সকালে বর্ম্মার হইতে টেলিগ্রাম আসিল;—এ অবস্থায় কোন ব্যক্তির সঠিক সংবাদ দেওয়া অসম্ভব।···

তখন ললিতার চিঠিই সীতার একমাত্র ভরসা হইয়া দাঁড়াইল। মনে-মনে সে ঠিক করিল, ললিতার নিকট হইতে উত্তর আসিলেই সে যাহা হয় একটা করিবে। প্রযোজন হয়, সে একাই বর্ম্মারের দিকে রওনা হইবে; একবার তাহার সন্ধান করিবে; তারপর—তারপর—কে জানে, তারপর কি করিবে সীতা আর তাহা ভাবিয়া পাইল না।······

বিভাবতী বলিতেছিল, তুমি ভাই তবু খুব মানুষ যাহোক্ যে, এততেও মাথা ঠিক করে' কাজ করতে পারচ!

সীতা হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এই সহজ কথারই ভিতর হইতে কি-একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা যেন

আচম্বিতে তাহার হৃদয়ে বিঁধিয়া বসিল। সত্যই, সংসারের ভিতর সে আজ বড়ই বিসদৃশ—বড়ই বেমানান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু কেন? কোন্ অপরাধে সে অপরাধিনী? সে ত' তাঁহার কোন অমঙ্গল স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই; তবে ভগবান্ কেন এমনি করিয়া সমস্ত দায়িত্বের জাল তাহারই চারিপাশে জড়াইয়া আনিতেছেন? একবার মনে হইল, বিভাবতীর নিকট তাহার জীবনের আদ্যন্ত সমস্ত ইতিহাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলে, 'ওগো, তোমরাই সকলে মিলিয়া বিচার কর, এ দুর্ঘটনার জন্য—এ বিপদের জন্য সত্যই আমি কোন্‌দিক দিয়া দায়ী!—দুঃখে, ক্ষোভে সীতার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; কেন না, তাহার মনে হইতে লাগিল, যতই সে জোর করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করুক, তাহার নিজেরই অন্তর কোন কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করিতেছে না।

পরের দিন আবার একখানা টেলিগ্রাম আসিল। সীতা খুলিয়া পড়িল। টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই:—

অবিলম্বে এখানে চলিয়া এস।—ললিতা।

একবার—দুইবার করিয়া সীতা টেলিগ্রামখানা বহুবার পড়িয়া দেখিল। যেন এই কয়টা কথার অর্থ বুঝিতে তাহার সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তিতেও কুলাইয়া উঠিতেছিল না। শেষে সেই হল্‌দে কাগজখানা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।...

প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সাম্‌নে প্রায়

আধ মাইল পড়া জমী একান্ত নির্জীব এবং নির্জ্জন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মৌন দৃশ্যের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সীতার মনে হইতে লাগিল, সংসারে সকলেই যেন আজ তাহার নাগাল হইতে অনেক—অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে। পুনরায় সে সেই এলোমেলো কাগজখানা খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।···তাহা হইলে ললিতা সকল খবরই পাইয়াছে! অথচ কোন কথাই তাহাকে লেখে নাই। কেন যে লেখে নাই, তাহার কারণ-টুকু উপলব্ধি করিতে সীতার বিলম্ব হইল না।...তাহা হইলে সত্যসত্যই সব শেষ হইয়াছে! স্বামী জীবিত থাকিলে ললিতা কখনই সে শুভ সংবাদটুকু তাহার কাছে গোপন করিত না।··· সীতার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া থাকার পর সে হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিভাবতীকে আসিয়া টেলিগ্রামখানা দেখাইল। * * *

নরেন্দ্রবাবু বিভাবতীর জন্য একটু চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু এ অবস্থায় সীতাকে কোনরকমে থাকিতে বলা যায় না। তাঁহার ও বিভাবতীর পরামর্শে সীতা সেই দিন বৈকালের ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইল।······

সেই ট্রেণ যখন ভোরের সময় হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সারারাত্রির জাগরণে সীতার মুখ-চোখ কালীমায় ভরিয়া গিয়াছে। সেই অবস্থায় সে তার ট্রাঙ্কটাকে একটা কুলির মাথায় দিয়া জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্লাটফরম্ পার হইয়া চলিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এই কর্ম্ম-

কোলাহলময় পৃথিবীর সহিত আজ তার আর কোন সম্বন্ধ নাই; যেন তার নিজের প্রতি পদক্ষেপটী ইহার বুকে আজ প্রকৃতই অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে!

ঠিকাগাড়ীর আড্ডার নিকট আসিলে হঠাৎ কে তাহার হাত ধরিতে তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে মুখ ফুটিয়া কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ললিতা তাহাকে টানিয়া লইয়া একখানা গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।......

সীতা খানিকক্ষণ ললিতার মুখের পানে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত গাঢ় এবং ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—ললিতা দিদি!

ললিতা তাহার কপালের রুক্ষ উড়ো চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে কহিল;—কি, বল্ না?

হঠাৎ ললিতার একখানা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া সীতা কহিল,—এবার একবার বল, তাঁর খবর কি?—

ললিতা মাথা নাড়িয়া কহিল,—না, এখন নয়। আগে বাড়ী চল; তারপর।

সীতা মুহূর্ত্তমাত্র নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—বুঝিচি;...কিন্তু, কিই বা তুমি লুকোবে দিদি? খারাপ খবর তুমি কতক্ষণ চেপে রাখবে বল?-বলিতে বলিতে সে একেবারে ললিতার কোলের উপর নিজের মাথাটা গুঁজিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষটীর মতই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ললিতা

তাহার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। * * *

ভবানীপুরে আসিয়া গাড়ী থামিয়া পড়িতে ললিতা নিজে নামিয়া বলিল,—নেমে আয়। রাস্তায় নামিয়াই সীতা চমকিয়া উঠিল। বলিল,—একি? ললিতা কোচ্‌ম্যানকে ট্রাঙ্ক নামাইতে বলিতেছিল; সীতার দিকে না তাকাইয়াই কহিল, কেন, বাড়ী ত' তোর অচেনা নয়! তুই আগে চল্; আমি যাচ্চি।—

এ যে নিশানাথের বাটী! মুহূর্ত্তমাত্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া সীতা ক্ষিপ্রপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা এবং সন্দেহের দোলায় তাহার বুকের স্পন্দন পর্য্যন্ত যেন থামিয়া যাইবার মত হইল! ভিতরে ঢুকিয়া সে না-জানি কি দেখিবে! হয়ত'—

বসিবার ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়াই সীতার মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইল!

ঠিক সম্মুখেই একখানি চেয়ারে একান্ত মগ্নভাবে বসিয়া নিশানাথ। মাথার চুলগুলি অত্যন্ত রুক্ষ, চোখদুইটার নীচে যেন কে খানিকটা কালী লেপিয়া দিয়াছে। পদশব্দে চমক্ ভাঙ্গিতেই নিশানাথও অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একই মুহূর্ত্তে দুইজনের সম্মুখে যেন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল!...

ঠিক সেই সময় একমুখ হাসি লইয়া ললিতা দু'জনের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল। বাহুবেষ্টনে সীতার মাথাটী জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—কি, ভারী আশ্চর্য্যি ঠেকৃচে, না? ওঁকে আর সেদিন কাশী পর্য্যন্ত যেতে হয় নেই যে! তোমরা মধুপুরে নেমে যেতে উনি টেনেটুনে ঝাঝা পর্য্যন্ত গিয়েই কাশী যাওয়ার খেয়াল ছেড়ে কল্‌কাতায় ফিরে আসেন। পরে স্পষ্ট নিশানাথকে লক্ষ্য করিয়া স্মিতহাস্যের সহিত কহিল, আর দেখে মনে হচ্চে, এ ক'টা দিন বোধ হয় এখানে বসে-বসেই সন্ন্যাস-সাধনা করচেন।

সীতার চিঠি পাইয়া ললিতা কৌশলে উক্ত সংবাদটুকু নিশানাথের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিল। সীতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া ললিতা কহিল,—পোড়ারমুখী, বুকের ভেতর এম্‌নি একটা সমুদ্র চেপে রেখে এতদিন দিক্‌ভুল হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি! বলিয়াই সে যেন কিসের একটা গভীর তৃপ্তি লইয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।...

বারেকের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া সহসা সীতার একখানি হাত কোলের উপর টানিয়া নিয়া নিশানাথ কহিল,—এবার ত' আর লুকোতে পার্‌বে না গৌরি!...বল, আমার সব অপরাধ ভুলে যাবে?...

সীতার সমস্ত শরীর তখন ঘামে ভিজিয়া হিম হইয়া উঠিয়াছিল।

সমাপ্ত